

বাংলা বুক পিডিএফ

ভয় পেয়ো না, নীলমানুষ!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়





রণজয়কে দেখলেই মনে হবে অন্য
গ্রহের মানুষ। লম্বায় আট ফুটেরও
বেশি, চওড়ায়ও তেমনি। ইয়া
মোটা-মোটা হাত-পা, এতো বড়ো
মাথা! ওকে দেখামাত্র সবাই ভয়ে
পালায়— ওরে বাবা রে! এই বুঝি
ধরলো! কেউ বলে— ওটা ব্রহ্মদত্তি!
কেউ বলে— নীল মানুষ! রণজয়ের
গায়ের রং নীল। আগে কিন্তু তার
গায়ের রং এমন নীল ছিল না, তার
এমন সৃষ্টিছাড়া চেহারাও ছিল না। সে
এই পৃথিবীর ছেলে— এই
বাংলাদেশের ছেলে। অন্য গ্রহের
মানুষরা রকেটে করে এসে তাকে
জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে চেহারাটা
বদলে দেয়। সে অন্যগ্রহ থেকে
লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে। বেঁটে
চেহারা গুটুলি আর দশাসই চেহারা
রঘু ডাকাত তার সাকরেন্দ হয়েছিল।
নীল মানুষ সভ্য জগতে আসতে চায়,
কিন্তু আসতে পারে না— জঙ্গলে
থাকতে হয় তাকে। তার রোমাঞ্চকর
নানা কাহিনীই— 'ভয় পেয়ো না, নীল
মানুষ!' মজার, অথচ পড়তে পড়তে
গায়ে কাঁটা দেয়।.....

ভয় পেয়ো না, নীল মানুষ!

www.banglabookpdf.blogspot.com

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



বিকাশ গ্রন্থ ভবন

৩৭/৩ বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা—৭০০ ০০৯

Bhoy peyo Na Nilmanush
by
Sunil Gangopadhyay

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা-১৯৯২

প্রকাশ করেছেন : ভারতী আচার্য ও ব্রতী আচার্য
৩৭/৩, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা : ৭০০ ০০৯

ছাপেছেন : স্বপন কুমার দে। দে'জ অফসেট,
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা : ৭০০ ০৭৩

টাইপসেটিং : আই. ই. আর. ই.
২০৯এ বিধান সরণী, কলকাতা—৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শ্রী অনুপ রায়

মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র

স্নেহের চিরন্তন ও সাযন্তনকে

www.banglabookpdf.blogspot.com



নীল মানুষ ও ছোট বন্ধু

কেন যে মা ওকে জন্ম থেকেই আদর করে গুটুলি বলে ডাকতো ?
সেই নামটাই ওর কাল হলো।

গুটুলির বয়েস বাড়লেও তার শরীরটা আর বাড়ে না। যখন সাত বছর বয়েস, তখন তাকে দেখাতো চার বছরের ছেলের মতন। দশ বছর বয়েসে দেখাতো সাত বছরের ছেলের মতন। চৌদ্দ বছর বয়েসে তাকে সবাই মনে করতো দশ বছরের ছেলে। তারপর যখন তার কুড়ি বছর বয়েস হয়ে গেল তখনও তার চেহারা দশ বছরের ছেলের মতই রয়ে গেল। সবাই বললো, গুটুলি আর বাড়ে না। তার চেহারা এখানেই থেমে থাকবে।

গুটুলির বুদ্ধি কিন্তু ঠিকই বেড়েছে। এমনকি কুড়ি বছর বয়েসের সাধারণ ছেলেদের চেয়েও তার বুদ্ধি অনেক বেশি। সে মুখে মুখে শক্ত অঙ্ক কষে দিতে পারে। মানুষের মুখ দেখেই গুটুলি বলে দিতে পারে, সে সত্যি কথা বলছে না মিথ্যে কথা। সে সাঁতার জানে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যাডেল করে সাইকেল চালাতে পারে। ইংরিজি কাগজ পড়ে খেলার খবর বুঝতে পারে, তবু কেউ তাকে পুরোপুরি মানুষ হিসেবে স্বীকার করে নিতে চায় না।

তার একটা ভালো নামও আছে, তার পুরো নাম পরেশচন্দ্র মাইতি। কিন্তু ও নামটা কেউ মনে রাখে না। লোকেরা তাকে গুটুলি, গুটগুটে, গুলগুলিয়া এই সব যা ইচ্ছে নামে ডাকে। পাড়ার ছেলেরা যখন তখন চাঁটি মারে তার মাথায়। ইস্কুলে উঁচু ক্লাসে ওঠার পর অন্য ছেলেরা তাকে এমন জ্বালাতন-পোড়াতন করতো যে, সে ইস্কুলে পড়াই ছেড়ে ছিল।

এমনকি গুটুলির ছোট ভাই বীরেশ, যার বয়েস ষোলো বছর, সেও তাকে দাদা বলে মানতে চায় না। যখন তখন হুকুম করে।

গ্রামের ছেলেদের অত্যাচারে গুটুলি এক-এক সময়ে কঁদে ফেললেও কেউ তাকে দয়া করে না, সবাই হাসতে শুরু করে তখন। কাঁদলে নাকি

তার চেহারাটা আরও মজার দেখায়। সবাই তাকে আরও কাঁদাবার চেষ্টা করে।

এখন আর গুটুলি কাঁদে না। মনে মনে সকলের ওপর তার বিষম রাগ। গায়ের জোরে পারবে না জেনেও এক-একদিন সে বড়সড় কোনো ছেলের দিকে রাগ করে তেড়ে যায়, পেটে ঘুমি মারে। তাতেও সবাই হাসতে হাসতে বলে, বামন ক্লেপেছে! বামন ক্লেপেছে! তারপর দু'তিন জন মিলে গুটুলিকে চাংদোলা করে তুলে জলে ফেলে দেয়।

গুটুলি একা-একা কোনো জায়গায় বসে মনে মনে বলে, একদিন সব প্রতিশোধ নোবো! একটা কোনো মন্ত্র পেয়ে আমার এমন গায়ের জোর হয়ে যাবে যে, সবাই আমার কাছে মাথা নিচু করে থাকবে। তখন সবাই বুঝি!

গুটুলিকে খুব ভালোবাসে তার মা। গুটুলিকে কেউ মারধোর করলে বা খোঁচালে মা তাড়াতাড়ি এসে তাকে ঘরে নিয়ে যায়। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলে, নারে লক্ষ্মীসোনা, কাঁদিস না! তুই একদিন ঠিক বড় হয়ে উঠবি। চেহারায় না হোস গুণে বড় হবি অন্যদের থেকে।

তখন আর তোর কোনো দুঃখ থাকবে না।

গুটুলির ঘরনি একুশ বছর বয়েস, তখন মাত্র দু'দিনের অসুখে ভুগে তার মায়ের মৃত্যু হলো। ছোটবেলা থেকেই গুটুলি তার বাবাকে দেখে নি। পৃথিবীতে তাকে ভালোবাসার আর কেউ রইলো না।

গুটুলি অন্ধ আর হিসেবপত্তর ভালো জানে বলে পাশের গ্রামের একটা মুদিখানায় সে চাকরি পেল। এই কাজে তো গায়ের জোর লাগে না, বসে বসে জিনিস-পত্র মাপা আর ঠিকঠাক দামের হিসেবপত্তর বুঝে নেওয়া। প্রথম প্রথম নতুন লোকেরা তাকে ছেলেমানুষ ভেবে ঠকবার চেষ্টা করতো, কিন্তু সর্বের তেলের কিলো আঠারো টাকা হলে দেড়শো গ্রামের দাম কত হয় তা গুটুলি এক-মুহুর্তে বলে দিতে পারে। দু' টাকা বাষট্টি পয়সার জিনিস কিনলে কুড়ি টাকার নোটে কত ফেরত দিতে হবে, তা গুনতে তার একটুও ভুল হয় না।

দোকানের মালিক গুটুলির কাজে বেশ খুশিই ছিল। ঐ দোকান ঘরেই গুটুলি রাত্তিরে শোয়, মালিকের বাড়ি থেকে তার জন্য দু'বেলা খাবার আসে।

এই রকম ভাবে কয়েক মাস বেশ চলছিল। কিন্তু এ সুখও গুটুলির ভাগ্যে বেশিদিন সইলো না।

একদিন দোকানের মালিক জিনিসপত্র কিনতে শহরে গেছে। গুটুলি একাই দোকান চালাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা দামোদর নামে একটা লম্বা-মতন লোক এসে গুটুলিকে হাতছানি দিয়ে দোকানের বাইরে ডেকে বললো, এই বিটুলে, পাঁচটা টাকা রোজগার করতে চাস?

গুটুলি বললো, আমার নাম বিটুলে নয়। আমি কারুর টাকাও চাই না!

দামোদর বললো, ও ভুল হয়েছে, তোর নাম গুটুলে, তাই না?

গুটুলি বললো, আমার নাম পরেশচন্দ্র মাইতি।

দামোদর বললো, ভাগ্! এইটুকু চেহারার অতবড় নাম? যা বলছি, তাই শোন্! খবর পেয়েছি, আজ আর তোর ঐ দোকানের মালিক শহর থেকে ফিরবে না। মাঝরাতিরে তুই দোকানের দরজা ভেতর থেকে খুলে দিবি। সে জন্য তুই পাঁচ টাকা পাবি।

গুটুলি মানুষ দেখলেই চিনতে পারে। সেই জন্য সে আগে থেকেই জানে যে ঐ দামোদর একটা চোর কিংবা ডাকাত। এর হাত থেকে বাঁচবার একটা উপায় করতে হবে।

সে বললো, দরজার অনেক উঁচুতে তালা। সেখানে আমার হাত যায় না। আমি কী করে দরজা খুলবো?

দামোদর বললো, মালিক না থাকলে তালা লাগায় হারাধন। তারপর চাবি থাকে তোর কাছে। সে খবর আমরা রাখি। তুই হারাধনকে বলবি তোর হিসি পেয়েছে, বাইরে যেতে হবে। ওকে চাবি দিয়ে বলবি তালা খুলে দিতে। তারপর আমরা যা করবার, করবো!

গুটুলি বললো, তারপর মালিক এসে যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে, তালা খোলার চাবি দিল কে?

দামোদর বললো, আমরা তোর হাত-পাঁ বেঁধে রেখে যাবো। তা হলে তোর নামে দোষ পড়বে না। সব দোষ পড়বে হারাধনের নামে, বুঝলি? মনে থাকে যেন। ঠিক রাত্তির সাড়ে বারোটায়।

গুটুলি আর কিছু না বলে দোকানে ফিরে এলো। হারাধন নামে আর যে একজন এই দোকানে কাজ করে, সে বোকা-সোকা মানুষ। সেও এই দোকানে শোয়। মালিকের বাড়ি থেকে সে-ই গুটুলির জন্য খাবার এনে দেয়।

সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর গুটুলি বললো, হারাধনদা, আজ রাত্তিরটা খুব সাবধানে থেকো। সারা রাত কিছুতেই দরজা খুলবে না। কেউ এসে

দরজায় খুটখাট করলেই আমরা দু'জনে মিলে খুব চাঁচাবো, যাতে পাড়ার সব লোক ছুটে আসে। দু'জনকেই জেগে থাকতে হবে।

এই কথা বললো বটে, কিন্তু একটু পরেই ঘুমে টেনে এল গুটুলির চোখ। সে কিছু বুঝবার আগেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়লো।

গুটুলির ঘুম ভাঙলো অনেক লোকের গোলমালে। ষড়ম্ভ করে উঠে বসেই সে দেখলো সকাল হয়ে গেছে। দোকান একেবারে ফাঁকা, সব কিছু চুরি হয়ে গেছে। এক পাশে পড়ে আছে হারাদন, তার হাত-পা-মুখ বাঁধা। দোকানের সামনে অনেক লোক ভিড় করে আছে।

গুটুলির খাবারের মধ্যে যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। হারাদনকে যতটা বোকা-সোকা সে ভেবেছিল, ততটা সে নয়। মানুষ চেনা অত সোজা নয়।

গুটুলির কথা কেউ বিশ্বাস করলো না। সবাই ভাবলো, গুটুলিই চোরদের সঙ্গে ষড়ম্ভ করে দরজা খুলে দিয়েছে। দোকানের মালিক ফিরে এসে ধপাধপ করে মারতে লাগলো তাকে। কেউ বললো, পুলিশে দাও! কেউ বললো, বেঁটের গাঁটে গাঁটে শয়তানি বুদ্ধি!

শেষ পর্যন্ত পুলিশে দেওয়া হলো না বটে কিন্তু দোকানের মালিক তাড়িয়ে দিল তাকে গ্রাম থেকে।

গ্রামের বাইরে একটা তালগাছের নিচে দাঁড়িয়ে গুটুলি প্রতিজ্ঞা করলো, একদিন সে ফিরে এসে প্রতিশোধ নেবে। ঐ দামোদর, হারাদন, দোকানের মালিক কারকে ছাড়বে না!

মনের দুঃখে বনে চলে গেল গুটুলি।

তা বনে যাওয়াও কি সোজা? জনমানবহীন সেরকম ঘন জঙ্গলও তো আজকাল বেশি নেই। নিজের গ্রাম আর পাশের দু'তিনখানা গ্রাম ছাড়া আর কোথাও কখনো সে যায়নি। তবু গুটুলি ঠিক করেছিল সে আর কোনোদিন নিজের গ্রামে ফিরে যাবে না। মানুষের হাতে অপমান আর অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে বনে গিয়ে বাঘ সিংহের পেটে যাওয়া ভালো।

গ্রামের বাইরে মাঠের শেষে যেখানে আকাশ এসে মিশেছে সেই দিকে হাঁটতে শুরু করে দিল সে। একটার পর একটা মাঠ পেরিয়ে যায় তবু আকাশ কাছে আসে না।

মাঠ পেরিয়ে গ্রাম আসে, কিন্তু গুটুলি কোনো গ্রামে ঢোকে না। সে আর কোনো মানুষকে বিশ্বাস করে না। তার চেহারা ছোট, তার গায়ে জোর নেই বলে কেউ তাকে গ্রাহ্য করে না! কিন্তু তার বুদ্ধি আছে।

বনে গিয়ে গুটুলি তপস্যা করবে। আগেকার দিনে মুনি-ঋষিরা তপস্যার জোরে দেবতাদের কাছ থেকে কত রকমের বর পেয়েছে। একালেও যা সেরকম হবে না কেন? গুটুলি এমন কঠোর তপস্যা করবে যে কোনো-না-কোনো দেবতাকে আসতেই হবে। সে লম্বা হবার বর চাইবে।

ঠিকমতন খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, গুটুলি হাঁটতেই লাগলো। সে পরে ছিল একটা খাকি হাফ-প্যান্ট আর কলার দেওয়া নীল গেঞ্জি। প্যান্টটা ছিঁড়ে গেল ফালাফালা হয়ে, ধুলো কাদা মেশে গেঞ্জিটা এমন হলো যে রং চেনাই যায় না। খুব তেষ্টা পেলে সে নদীর জল খায়, খিদে পেলে কবে সে ভালো ভালো খাবার খেয়েছে সে সব কথা চিন্তা করতে করতে ভেঁতুল গাছের পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।

এইভাবে কতদিন কেটে গেল, কে জানে। এক সময় গুটুলি একটা জঙ্গল দেখতে পেল। প্রথমে জঙ্গলটা পাতলা-পাতলা, এখানে ওখানে কয়েকটা করে গাছ। কাছাকাছি কিছু লোকের বাড়িঘরও আছে। কিন্তু যতই সে ভেতরে ঢুকতে লাগলো, ততই জঙ্গলটা খুব গভীর। গুটুলি আরও ভেতরে যেতে চায়, যেখানে কোনো মানুষজন যায় না।

দিনের বেলা জঙ্গলে প্রায় কোনো সাদা-শব্দ থাকে না। সন্দের পরই জঙ্গল যেন জেগে ওঠে। ভাবতে থাকে অসংখ্য বিবি-শোকা। শুকনো পাতার ওপর খসখস, সরসর শব্দ হয়। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায় আলোর ফুটকি, সেগুলি জোনাকি না বাঘ-ভাল্লুকের চোখ, তা বোঝার উপায় নেই।

গুটুলি খুব একটা ভয় পেল না। সে তো জানেই, বনে অনেক বিপদ আছে। কিন্তু বনে অপমান নেই।

অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজে আন্দাজে একটা গাছ খুঁজে নিয়ে গুটুলি সেই গাছ বেয়ে উঠে গেল ওপরের একটা মোটা ডালে। তারপর সেখানে বসে রইলো। প্রথম রাতটা এই ভাবে কাটুক, তারপর কাল সকালের আলোর বনটা ভালো করে দেখে নিতে হবে। একটা নিরাপদ থাকার জায়গা পাওয়া যাবেই। খিদেয় তার পেট ঝলে যাচ্ছে, কিন্তু গুটুলি ভাবলো জঙ্গলে কত রকম ফলের গাছ থাকে, কাল দিনের বেলা কিছু-না-কিছু জুটে যাবেই।

মাঝে মাঝে গাছের তলায় কী সব জন্তু যেন দৌড়ে যাচ্ছে। খরগোশ, হরিণ কিংবা চিতাবাঘও হতে পারে। একবার ধপ্ধপ্ শব্দ করে কী যেন হেঁটে গেল। হাতি নাকি? আওয়াজটা ঠিক মানুষের হাঁটার মতন। কিন্তু মানুষ হাঁটলে তো অত জোর শব্দ হয় না!

একবার গুটুলির উকুর ওপর কী যেন একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগলো। তারপর ফোঁস-ফোঁস শব্দ। নিশ্চয়ই সাপ। গুটুলি জানে সাপকে বিরক্ত না করলে সাপ সহজে কামড়ায় না। সে নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলো। সাপটা চলে গেল তার গায়ের ওপর দিয়ে।

রাত শেষ হয়ে যেই ভোরের আলো ফুটলো, অমনি বদলে গেল সব কিছু। দিনের আলোয় বনের মধ্যে একটুও ভয় থাকে না। কতরকম ফুল ফুটেছে, কত পাখি ডাকছে। পাখিগুলো যে এদিক-ওদিকে উড়ে যাচ্ছে, তার মধ্যেই যেন কত আনন্দ।

গুটুলি গাছ থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা জায়গা ঘুরে দেখলো। এক জায়গায় অনেকগুলো জাম গাছ। সেই সব গাছ একেবারে কালোজামে ভরে আছে। সেই কালোজাম খেয়েই পেট ভরিয়ে ফেললো সে। তারপরেই দেখলো আর কয়েকটা বাতাবি লেবুর গাছ। গুটুলি ভাবলো, থাক, ওগুলো বিকেলে খাওয়া যাবে।

এই জঙ্গলের মধ্যে ছোট-ছোট পাহাড়ও আছে। এক জায়গায় পাশাপাশি দুটো ছোট-ছোট টিলা, নরম ঘাসে ঢাকা। একটা টিলার গায়ে একটা গুহার মতন রয়েছে। ওখানে অনায়াসে রাস্তিরে থাকা যাবে। জায়গাটা গুটুলির বেশ পছন্দ হলো।

এইবার আসল কাজ শুরু করতে হবে। একটা গাছের তলায় সে বসলো গুহিরে। সামনেই অন্য টিলাটার মাথায় সূর্য উঠেছে। হাওয়া দিচ্ছে মিষ্টি-মিষ্টি। জ্ঞান হবার পর থেকে গুটুলির এত ভালো আর কোনো দিন লাগেনি।

হাতজোড় করে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, হে ঠাকুর, দেখা দাও! আমি মন্ত্র জানি না! কী করে তপস্যা করতে হয়, তাও জানি না। তবু একবার দেখা দাও! আমি বেশি কিছু চাইবো না, শুধু একটাই জিনিস চাইবো....

এই কথাগুলোই সে বলতে লাগলো বারবার। এক সময় তার চোখ বুঝে এলো। তবু কথাগুলো বলে যেতে লাগলো ঠিকই।

হঠাৎ একসময় কে যেন প্রচণ্ড গর্জনে বলে উঠলো, এই!

ভয়ে একেবারে কঁপে উঠলো গুটুলি। কে চাঁচালো? মানুষের গলার মতন, কিন্তু মানুষের গলা কি এত জোর হতে পারে? ঠিক যেন বাজ পড়লো আকাশ থেকে।

গুটুলি দেখলো তার সামনে একটা বিরাট মানুষের ছায়া। আর ও মুখ তুলে দেখলো, টিলার মাথায় প্রকাণ্ড বড় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক যেন আকাশ থেকে নেমেছে। মানুষটির গায়ের রং একেবারে ঘন নীল।

তা হলে গুটুলির ডাক শুনে এত তাড়াতাড়ি স্বর্গ থেকে নেমে এলো কোনো দেবতা! কিন্তু দেখলে যেন দেবতার বদলে দৈত্য বলেই মনে হয়। খালি গা, বুক বড় বড় লোম, মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা।

সেই প্রকাণ্ড মানুষটি কয়েকটা লাফ দিয়ে চলে এলো একেবারে গুটুলির সামনে। মাথাটা নুইয়ে গুটুলির দিকে অবাক ভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী রে, তুই এই টুকুনি বাচ্চা ছেলে। একা-একা এই জঙ্গলে কী করছিস?

গুটুলি বলল, আমি বাচ্চা ছেলে নই, আমার বয়েস একুশ বছর। প্রভু, আমি আপনার দয়া চাইতেই এখানে এসেছি!

প্রকাণ্ড লোকটি বললো, আমার কাছ থেকে দয়া চাইতে এসেছিস? তুই কী করে জানলি, আমি এখানে থাকি?

প্রভু, আমি যে জানি, মন দিয়ে ডাকলে দেবতারা আকাশ থেকে নেমে আসে!

দৈত্যটা বাতাস কাঁপিয়ে হা-হা করে হেসে উঠলো। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললো, আমি প্রভুটু কেউ নই। আমি তোদেরই মতন একজন মানুষ। আমার নাম রণজয়।

গুটুলি তবু হাত-জোড় করে বললো, কেন আমার সঙ্গে ছলনা করছেন, প্রভু? আমি জানি আপনি আকাশ থেকে এসেছেন। আগে তো কখনো আমি দেবতা দেখিনি। আপনার গায়ের রং নীল। রামায়ণ বইতে আমি শ্রীরামচন্দ্রের গায়ের রংও নীল দেখেছি। ক্যালেণ্ডারে শ্রীকৃষ্ণেরও গায়ের রং নীল থাকে। প্রভু, আমি শুধু আপনার কাছে একটা বর চাইবো।

লোকে যেমন পুতুল নিয়ে আদর করে, সেই রকম ভাবে প্রকাণ্ড লোকটি এক হাতে গুটুলিকে তুলে নিয়ে এলো মুখের কাছে। তারপর বললো, এবারে তোকে এক কামড়ে খেঁরে কেঁলি?

গুটুলি বললো, যদি ইচ্ছে হয় তো তাই করুন। বর না পেলে আমি এমনিই তো আর ঘিরে যাবো না, ঠিক করেছি।

প্রকাণ্ড মানুষটি বললো, আশ্চর্য! সবাই আমার দেখলে ভয়ে পালায়। এত কাছাকাছি এলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আর এই ছোট্ট মানুষটা একটুও ভয় পাচ্ছে না। তুই কী বর চাইতে এসেছিস এই জঙ্গলে?

গুটুলি বললো, প্রভু, আপনি শুধু আমাকে লম্বা হবার বর দিন। একুশ বছরের ছেলেটা যত বড় হয়। তার চেয়েও বেশি লম্বা করে দিন।

মোমের মতন ফোঁস শব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নীল মানুষটি বললো, জায়গা, হায়রে, লম্বা হবার যে কী দুঃখ, তা তো তুই জানিস না! আমার কার্ফীসি শুনিবি? আমার নাম বণজয়। আমারও বয়েস এগুন একুশ। অনেকদিন আগে আকাশ থেকে একটা গোল জিনিস খসে পড়েছিল, সেটা জোয়ার ফলেই আমার এই অবস্থা। তারপর থেকেই আমার গায়ের রং নীল হয়ে যায়, আর আমার শরীরটা বাড়তে থাকে। বেড়ে বেড়ে এতখানি হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রায় ডবল। আরও কত লম্বা হবো, কে জানে! এই চেহারার জন্য আমি মানুষের সামনে যেতে পারি না। আমার মা-বাবাও আমায় চিনতে পারে না! ওঃ, লম্বা হবার কী কষ্ট, তুই কি বুঝবি!

লম্বা নীল মানুষ বারবার করে কঁদে ফেললো।

আর তাই দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো গুটুলি।

কামা থামিয়ে নীল মানুষ বললো, এ কী, হাসছিস কেন?

গুটুলি বললো, হাসবো না? কী অদ্ভুত মিল আমাদের দু'জনের। আমি বেঁটে বলে সবাই আমার অত্যাচার করে, তাই আমি সব কিছু ছেড়ে জঙ্গলে চলে এসেছি। আর আপনি লম্বা বলে আপনার এত দুঃখ, আপনাকে দেখলে লোকে ভয় পায়। আপনি মানুষের কাছে যেতে ইচ্ছে করলেও যেতে পারেন না।

ঠিক বলেছিস। তুই খুব ভালো ছেলে রে। তুই এই জঙ্গলে থাকবি আমার কাছে?

জঙ্গল ছাড়া আর তো কোনো জায়গায় আমার থাকার জায়গা নেই।

সেই ভালো, আজ থেকে আমরা দু'জনে বন্ধু হলাম।

গুটুলি বললো, আমি যা পারিনি, তুমি তা পারবে। তুমি যা পারো নি, আমি তা পারবো! এতদিন আমার একজনও বন্ধু ছিল না। জঙ্গলে দেবতা খুঁজতে এসে পেয়ে গেলুম বন্ধু।

কয়েকদিন পরে জঙ্গল থেকে আবার বেরিয়ে এলো গুটুলি।

এখন সে পরে আছে সম্যাসীদের মতন গেরুয়া কাপড়, মাথায় পাগড়ি, এক হাতে একটা কমণ্ডলু আর অন্য হাতে ত্রিশূল। জঙ্গলের মধ্যে অনেক কালের একটা ভাঙা শিবমন্দির আছে, সেইখানে এই সব জিনিস পেরেছে।

মাঠ-ঘাট পেরিয়ে সে একটা বড় গ্রামে ঢুকলো। এখন তার মুখ-চোখের চেহারাটাই অন্য রকম। সে আর মানুষজনদের ভয় পায় না। সম্যাসী দেখলে গ্রামের মানুষ এখনো বেশ খাতির করে, যা সে সম্যাসী বেঁটে হোক, রোগা কিংবা মোটা, যা-ই হোক।

বোম ভোলানাথ! জয় শঙ্কর। এই সব বলতে বলতে গুটুলি সেই গ্রামের শ্মশানের ঘাটে একটা গাছতলায় গিয়ে বসলো।

শ্মশানে আগে থেকেই আর একজন সাধু ছিল। তার বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা, মুখ-ভর্তি দাড়ি, মাথায় জটা, চোখ দুটো জল্জল্ করছে। তার সামনে বসে আছে দু'তিনজন ভক্ত!

বড় সাধু খানিকক্ষণ এই বাচ্চা সাধুকে আড়চোখে দেখলো। তারপর এক সময় হুঙ্কার দিয়ে বললো, অ্যাঁই, তুই আমার জায়গায় কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলি রে? তুই কার চালা?

গুটুলি একটুও ভয় না পেয়ে বেশ তেজের সঙ্গে বললো, আমি বোম ভোলানাথের চালা!

বড় সাধু বললো, হঁ! নাক টিপলে দুধ বেরোয়, এর মধ্যে ভেঙ্ ধরেছিস? ভালো চাস তো এদিকে আয়, আমার পা টিপে দে!

গুটুলি গভীর ভাবে বললো, আমি তোমার থেকে বয়েসে বড়! একবার বলেছো বলেছো আর দ্বিতীয়বার ওরকম কথা বলো না!

বড় সাধু বললো, অ্যাঁ! কী বললি?

গুটুলি বললো, কানে ভালো শুনতে পাও না বুঝি? বললুম যে আমি তোমার থেকে বয়েসে অনেক বড়। আমার নাম দীঘাচার্য। আমার বয়েস তিনশো তিন বছর।

গুটুলির উচ্চতা মোটে সাড়ে তিন ফুট আর তাকে দেখতে দশ বছরের ছেলের মতন। তার মুখে এই কথা শুনে বড় সাধুর সামনে বসে-থাকা ভক্ত ক'জন ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো।

বড় সাধু রেগে গিয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এই সময় একদল লোক হৈ হৈ করে একটা মড়া নিয়ে এলো। তার পেছনে পেছনে আর একদল লোক এলো কাঁদতে কাঁদতে। সুতরাং দুই সাধুতে তখন আর কোনো কথা হলো না।

গুটুলি চোখ বুজে বোম শঙ্কর, বোম ভোলানাথ বলতে লাগলো আবার।

গ্রামে রটে গেল যে শ্মশানে একটা বাচ্চা সাধু এসেছে, সে বড় সাধুর মুখে মুখে কথা বলে।

অনেকে দেখতে এলো এই নতুন সাধুকে। কিন্তু গুটুলি সেই যে চোখ বুজেছে, আর চোখও খোলে না, কারুর সঙ্গে কথাও বলে না। তা দেখে লোকের ভক্তি বেড়ে গেল। কেউ বললো, সাধুর মুখ দিয়ে জ্যোতি বেরুচ্ছে।

কেউ বললো, ঠ্যা, দেখলেই বোঝা যায়, এ সাধুর বায়েস তিনশো বছরের বেশি!

সন্দের পর শ্মশান খালি হয়ে গেল। ভূতের ভয়ে রাত্রিরের দিকে এদিকে কেউ আসে না। অন্ধকার হয়ে যাবার পর বড় সাধু কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বাললো। গুটুলি তখনো চক্ষু বুজে আছে।

বড় সাধু তার কাছে এসে বললো, আর ডড়ং করতে হবে না। এইবার বল দেখি, তুই কে? বাড়ি থেকে বাপ-মা'র ওপর রাগ করে পালিয়ে এসেছিস, তাই না?

গুটুলি বললো, আমার বাবা-মা কেউ নেই। তিনশো তিন বছর আগে আমার জন্ম। একশো বছর অন্তর অন্তর আমার চেহারা ছোট হয়ে যায়, আবার বাড়ে। আবার ছোট হয়, আবার বাড়ে। এবারে বুঝলে?

বড় সাধু বললো, আমার কাছেও বুজুকি, ঠ্যা?

বলেই সে গুটুলির ঘাড় ধরে মাটি থেকে টেনে তুললো। তারপর বললো, আমি আসলে কে জানিস? আমার নাম রঘু সরদার। আমার নাম শুনেলে পঞ্চাশটা গ্রামের লোক এখনো ভয়ে কাঁপে। শোন, আমার সেবা-যত্ন করলে এখানে থাকতে পারবি। নইলে তোর টুঁটি টিপে নদীর জলে ফেলে দেবো।

গুটুলি বললো, ঠিক আছে, তোমার সেবা-যত্ন করবো। যত চাও! আগে নদীতে স্নান সেরে আসি, কিছু খেয়ে-টেয়ে নিই। তবে একটা কথা বলে রাখি। কারুর চেহারা ছোট হলেই তাকে মেরে ফেলার ভয় দেখাতে নেই!

বড় সাধু ছেড়ে দিতেই গুটুলি নদীর ধারে নেমে গেল। তারপর চোঁচিয়ে গান ধরলো, 'কে বিদেশী স্নান-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজায় বনে!

রাত ঘোর হবার পর সেখানে এসে হাজির হলো নীল মানুষ। গুটুলির গান শুনে নদীর ধারে পৌঁছে বললো, কী বন্ধু? সব ঠিকঠাক আছে তো?

গুটুলি বললো, বন্ধু, আমাকে তোমার কাঁধে তুলে নাও!

নীল মানুষ ঝুঁকে পড়ে গুটুলিকে তুলে নিল কাঁধে। গুটুলি দু'দিকে পা ঝুলিয়ে বসলো। তারপর বললো, এবারে চলো তো বন্ধু, যেখানে আগুন জ্বলছে!

বড় সাধু ধূনির আগুনে হাঁড়ি চড়িয়ে ভাত রান্না করছিল, মাটির ওপর ধপ ধপ করে আওয়াজ হতে সে চমকে মুখ তুলে তাকালো।

গুটুলি বললো, এই যে সাধুজী, পা টেপাবে বলছিলে, কই পা ঝার করা!

ধুনির আগুনের অল্পস্ট আলোয় বড় সাধুর প্রথমে ঘন হলো নাক্স সাধুটা যেন ভালগাছের মতো লম্বা হয়ে গেছে। তারপর সে দেখলো কলাগাছের মতন দুটো পা, তাতে আবার নীল রং!

বড় সাধু উঠে আঁতকে চোঁচিয়ে উঠলো, ওরে বাবারে! ব্রহ্মদৈতা এসেছে রে! মরে গেলাম রে!

তাই শুনে নীল মানুষ হাসি চাপতে পারলো না। তার হাসিতে গম-গম করে উঠলো জায়গাটা।

বড় সাধু এক লাফ মেরে দৌড়লো অন্ধকারের মধ্যে আর চিৎকার করতে লাগলো, বাঁচাও! বাঁচাও! ভূত, ব্রহ্মদৈতা!

নীল মানুষ লম্বা হাত বাড়িয়ে খপ করে তাকে ধরে ফেলে বললো, যাচ্ছে কোথায়?

গুটুলি বললো, তোমার সেবা করতে এসেছি, তুমি ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছে?

দু'রকম গলায় আওয়াজ শুনে বড় সাধু আরও ভয় পেয়ে বলতে লাগলো, মরে গেলাম! মরে গেলাম! মরে গেলাম!

গুটুলি নীল মানুষের গা বেয়ে সরসর করে নেমে এলো নিচে। তারপর ধমক দিয়ে বললো, আঃ, বড় চাচ্ছো! এবারে চুপ করো! নইলে সত্যি গলা টিপে দেবো!

চিৎকার থামিয়ে বড় সাধু একবার গুটুলিকে আর একবার নীল মানুষকে দেখতে লাগলো। তার মুখখানা হাঁ হয়ে গেছে।

নীল মানুষ বললো, তুমি সাধু-মানুষ হয়ে এত ভয় পাচ্ছো কেন? তোমাদের তো ভূত-প্রেত দেখেও ভয় পাবার কথা নয়!

বড় সাধু হাতজোড় করে বললো, আমায় ক্ষমা করে দাও! আমায় তোমরা প্রাণে মেরো না! আমি আসল সাধু নই। আমার নাম রঘু সরদার।

গুটুলি বললো, তুমি সাধু নও! তোমার আসল নাম রঘু সরদার, তার মানে তুমি কিসের সরদার?

রঘু সরদার বললো, আগে আমার ডাকাত দল ছিল। কিছুদিন হলো পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য আমি সাধু সেজে আছি!

গুটুলি বললো, প্রথমেই যে এরকম একজনকে পেয়ে যাবো, তা আশাই করিনি! বন্ধু, এবারে একে নিয়ে কী করা যায়, বলো তো!

নীল মানুষ বললো, ওর হাড়গোড় ভেঙে দ করে দিতে পারি। কিংবা ওর পা দুটো গাছের ডালে বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে দিতে পারি। কিংবা

ওকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে বাঘের সামনে যেন দিতে পারি। কিংবা ওকে ক্ষমাও করে দিতে পারি! তুমি কোন্টা চাও?

রঘু সরদার নীল মানুষের পায়ে কাছ হাঁটু গেড়ে বসে বললো, ওগো ব্রহ্মদেতা, আমার ক্ষমা করে দাও! আমি আর কোনোদিন চুরি-ডাকাতি করবো না!

নীল মানুষ বললো, আমার পায়ে ধরলে হবে না। আমার বন্ধুর পায়ে ধরতে হবে!

রঘু সরদার তক্ষুনি পেছন ফিরে গুটুলির পায়ে ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর বলতে লাগলো, ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও!

গুটুলি খানিকটা সরে গিয়ে বললো, আঃ, আজ বড় আনন্দ হলো। এর আগে কেউ আমার কাছে ক্ষমা চায়নি। ওহে রঘু সরদার, ওঠো, তোমায় ক্ষমা করে দিলুম।

নীল মানুষ বললো, সে-ই ভালো, কী সুন্দর ভাতের গন্ধ আসছে! কোথায় যেন ভাত রান্না হচ্ছে।

ধূনির আগুনে রঘু সরদারের চাপানো হাঁড়িতে ভাত ফুটেছে। সেইদিকে তাকিয়ে গুটুলি বললো, সত্যি, কতদিন ভাত খাইনি। ফল-টল খেতে খেতে মুখে অরুচি ধরে গেছে। ওহে রঘু সরদার, তোমায় যে ক্ষমা করে দেওয়া হলো, তার বদলে আমাদের ভাত খাওয়াও!

রঘু সরদার বললো, নিশ্চয়ই! ভাত, আলু-সেদ্ধ, ডিম-সেদ্ধ, কাঁচা লঙ্কা...খিও আছে। তোমার এই ব্রহ্মদেতা কি খি খায়?

নীল মানুষ হাসতে হাসতে বললো, আমি সব খাই! আগে মানুষের মাংস খেতাম, এখন শুধু সেটা ছেড়ে দিয়েছি।

রঘু সরদার রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। গুটুলি আর নীল মানুষ পাশাপাশি বসলো আগুনের ধারে।

গুটুলি রঘু সরদারকে বললো, আমরা দুই বন্ধু প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমাদের মতন বদমাশ লোকদের ক্ষমা চাওয়াবো। তুমি হলে এক নম্বর!

নীল মানুষের সংসার

www.banglabookpdf.blogspot.com



নীল মানুষের সংসার

রঘু সরদার আগে ছিল ডাকাত, পরে সে পুলিশের ভয়ে সাধু সেজেছিল। এখন সে হয়েছে রান্নার ঠাকুর। সে গুটলি আর নীল মানুষের জন্য রোজ ভাত-ডাল রান্না করে।

রঘু সরদারের মনে বড় দুঃখ। সে এখনো বুড়ে হয়নি, তার গায়ে জোর আছে, তবু তাকে কিনা জঙ্গলের মধ্যে বন্দী থেকে এরকম একটা ছোট কাজ করতে হয়! যখন সে ডাকাতির সদার ছিল তখন তার দলের দশ-বারো জন লোক তার হুকুম শুনতো, গ্রামের লোক তার নাম শুনে ভয়ে কাঁপতো, মাঝ রাত্তিরে মশাল নিয়ে রে রে রে রে করে গ্রামের কোনো বাড়িতে চড়াও হলে সে বাড়ির লোক টাকা-পয়সা গয়না-পাণি সব ফেলে দিত তার পায়ের কাছে। কত আনন্দ ছিল তাতে।

সাধু সেজে থাকার সময়েও কম আনন্দ ছিল না। দলের তিনজন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তার নাম বলে দেওয়ায় কিছুদিনের জন্য তাকে গা-ডাকা দিবে থাকতে হয়। অন্য গ্রামে এসে শাসানের ধারে সাধু সেজে বসলে গ্রামের মানুষ বেশ ভক্তি করে, পুলিশেও বিরক্ত করে না। সাধু-সাজা অবস্থায় রঘু সরদারের খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালোই জুটছিল, ডাক্তারের হুকুম করলে তার পা টিপে দিত। এখন কিনা ঐ বেঁটে বাঁটকুল গুটলির হুকুম শুনতে হয় তাকে। এমনকি গুটলির পা-ও টিপে দিতে হয় মাঝে মাঝে।

এখান থেকে পালাবারও কোনো উপায় নেই। রঘু সরদার বুঝতে পেরেছে যে, পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়লে ঐ আট ফুট লম্বা নীল মানুষ শুধু তাকে তুলে একটা আছাড় দিলেই সব শেষ। রঘু সরদারের এখনো ধারণা, নীল মানুষ ঠিক মানুষ নয়, ব্রহ্মদৈত্য জাতীয়ই কিছু হবে। গায়ের রং আবার গাঢ় নীল রঙের। তবে নীল মানুষের স্বভাবটা তেমন হিংস্র নয়, বেশির ভাগ সময়েই শুয়ে-বসে আলস্য করে আর হাসি-ঠাট্টা করে কথা বলে। বরং ঐ মাত্র তিন ফুট চেহারার গুটলিটাই পাজী, ওর গাঁটে-গাঁটে

বুদ্ধি। নীল মানুষ ওর বুদ্ধিতেই চলে। ঐ গুটুলিই ঠিক করেছে যে, রঘু সরদারকে পুরো এক বছর জঙ্গলে থেকে ওদের সেবা করতে হবে। তারপর যদি সে নাক-কান মূলে প্রতিজ্ঞা করে যে, আর কোনোদিন ডাকাতি করবে না, কিংবা সাধু সেজে লোককে ঠকাবে না, তা হলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

রঘু সরদার মনে মনে উপায় খোঁজে, কী করে ঐ গুটুলিটাকে জঙ্গল করা যায়।

সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রঘু সরদার ঝনার পাশে বাসন মাজতে বসলো। এটাও তাকে করতে হয়। এই সময়টায় তার সবচেয়ে বেশি রাগে গা জ্বলে যায়। সে ছিল কিনা একজন নামকরা ডাকাত সরদার। তাকে এখন মেয়েদের মতন বাসন মাজতে হচ্ছে।

সে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো নীল মানুষ একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছে আর গুটুলি একটু দূরে বসে একখানা বই পড়ছে। গুটুলি প্রায়ই একা-একা শহরে যায়, আর নানান জিনিস-পত্তর জোগাড় করে আনে।

বই থেকে মুখ তুলে গুটুলি বললো, বড্ড পান খেতে ইচ্ছে করছে। কতদিন পান খাই নি। রঘু, কয়েক খিলি পান এনে দাও তো।

রঘু সরদার বললো পান? এই জঙ্গলের মধ্যে আমি পান কোথায় পাবো?

গুটুলি বললো, জঙ্গলের মধ্যে পান পাওয়া যাবে না, জানি। কিন্তু বাঁদিকে এই টিলার পাশ দিয়ে মাইল তিনেক হেঁটে গেলেই একটা বড় রাস্তা পাবে। একটা হাইওয়ে। সেখানে একটা পেট্রল পাম্পের পাশেই একটা পান-বিড়ির দোকান আছে। সেখান থেকে নিয়ে এসো।

রঘু সরদার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি একলা পান আনতে যাবো?

গুটুলি তার দিকে একটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বললো, হ্যাঁ, যাও, পান নিয়ে এসো। বেশি দেরি করো না যেন।

রঘু সরদারের ভুরু কপালের অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। সে ব্যাপারটা বুঝতেই পারছে না। তাকে একলা-একলা পাঠানো হচ্ছে জঙ্গলের বাইরে? সেইখানে হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি-ট্রাক চলে। কোনো -একটা ট্রাকে উঠে তো সে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে পারে।

গুটুলি কি তাকে লোভ দেখাচ্ছে?

একটা হ্যান্ড-ব্যাগে রঘু সরদারের কিছু নুকোনো টাকা ও কয়েকটা

জামা কাপড় পরেছে। রঘু সরদার একবার সেদিকে তাকালো। ঐ ব্যাগটির মায়া ত্যাগ করতে চলে।

মেপের গজনের মতন নাক ডাকিয়ে গুমোচ্চ নীল মানুষ। সে সজ্জা জাগবে না মনে হয়।

রঘু সরদার বললো, ঠিক আছে তা হলে পান নিয়ে আসি!

গুটলি বললো, বেশি দেরি করো না কেমন? আর ছাঁ, ভালো কথা, তুমি দামোদর বলে কারকে চেনো?

রঘু সরদার বললো, দামোদর? কেমন দামোদর?

গুটলি বললো, তোমার মতন ডাকাতি টাকাতি করে?

রঘু সরদার জিজ্ঞেস করলো, তার কি বাঁ হাতের দুটো আঙুল কাটা? কথা বলতে বলতে হঠাৎ ভোতলা হয়ে যায়?

ঠিক ধরেছো। সেই দামোদরই বটে!

সে তো এক সময় আমার দলেই ছিল। পরে নিজের আলাদা দল খুলেছে, শুনেছি। তাকে তুমি চিনলে কী করে?

চেনা হয়েছিল এক সময়। তুমি যে দোকানে পান কিনতে যাচ্ছে দামোদরই এখন সেই দোকানের মালিক।

এঃ, বাটা ডাকাতি ছেড়ে এখন পানওয়ালা সেজেছে।

ডাকাতি ছাড়ে নি! তুমি যেমন পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য কিছুদিন সাধু সেজেছিলে, ঐ দামোদরও তেমনি পানওয়ালা সেজেছে! তুমি ঐ দামোদরকে এখানে ডেকে আনতে পারবে?

এখানে?

হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

কথা শুনে, পিস্তি খলে যায়। ঐটুকু একটা মানুষ যাকে রঘু সরদার জিপে মেরে ফেলতে পারে, সে কি না বসে বসে অকুম চালিয়ে যাচ্ছে! ব্রহ্মদৈত্যটাকে ও কী করে বশ করলো কে জানে!

রঘু সরদার জজলের মধ্যে দিয়ে খানিকটা হেঁটে তারপর দৌড়াতে শুরু করলো। মাঝে মাঝে সে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখছে যে, নীল মানুষ তাকে তাড়া করে আসছে কি না! না সে-রকম কোনো চিহ্ন নেই। বন একেবারে নিস্তব্ধ।

ছুটেতে ছুটেতে সে ভাবতে লাগলো, বড় রাস্তায় পৌঁছে সে কী করবে? দামোদরের সঙ্গে দেখা করবে? কী দরকার? আপনি বাঁচলে বাপের মাম। সোজা একটা গাড়িতে উঠে পালিয়ে যাওয়াই তো ভালো।

হাতে একটা কোনো অস্ত্র নেই, সঙ্গে কোনো টাকাপয়সা নেই, শুধু মাত্র একটা টাকা সম্বল। তবু রঘু সরদার ঠিক করলো, এবারে সে পালাবেই।

সে বড় রাস্তায় পৌঁছে গেল বিনা বাধায়। পেট্রল পাম্পটাও চোখে পড়লো। তার পাশে একটা পানের দোকান আছে ঠিকই। রঘু সরদার আড়াল থেকে দেখলো, আঙুল-কাটা দামোদর সেখানে বসে আছে ঠিকই। তার পাশে একজন বসে আছে। তার নাম ন্যাড়া গুলগুলি। ওর রোগা ছোট্টখাটো চেহারা, কিন্তু দারুণ ছুরি চালায়, চোখের নিমেষে যে-কোনো লোকের পেট ফাঁসিয়ে দিতে পারে। ওরা দুজন যখন জাঁকিয়ে বসেছে, তখন নিশ্চয়ই বড় কোনো মতলব আছে।

রঘু সরদারের একবার লোভ হলো দামোদরের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে। আট-দশজন লোক জুটিয়ে যদি একটা দল গড়া যায়, তাহলে ঐ লম্বা নীল মানুষটা আর বাঁটকুল গুলিটাকে ভয় কী! ওদের কাছে তো ছুরি-বন্দুক নেই।

কিন্তু নীল মানুষের চেহারাটা মনে পড়তেই তার বুক কঁপে উঠলো। ও যদি ব্রহ্মদৈত্য হয়, তা হলে তো গুলি-গোলাও হজম করে ফেলবে! নীল মানুষটা একদিন গুলিকে কী যেন সব বলছিল, পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহের কথা। ও কি সেখান থেকে এসেছে নাকি? তা হলে বাংলায় কথা বলে কী করে?

দরকার নেই বাবা, এ তল্লাট থেকে একেবারে চম্পট দেওয়াই ভালো।

রঘু সরদার পেট্রল পাম্পটার কাছাকাছি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলো। এ রাস্তা দিয়ে বাস চলে না। কিন্তু অন্য কোন গাড়ি পেট্রল পাম্প থামলেই সে তাতে উঠে পড়বে।

আধঘণ্টা পরে একটা অ্যান্ড্রাসেডার গাড়ি এসে থামলো। তাতে দু'জন মহিলা, দু'জন বাচ্চা আর দু'জন পুরুষ মানুষ। রঘু সরদার বিরক্তিতে মুখটা কোঁচকালো। এ গাড়িতে তাকে নেবে না।

দুটো ট্রাক ঝড়ের বেগে চল গেল, থামলোই না। আর-একটা গাড়ি থামলো, তাতে শুধু ড্রাইভার আর পেছনের সীটে একজন মোটা-মতন লোক। এবারে রঘু সরদার গাড়িটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে কাচুমাচু মুখে বললো, ভাই, আমার খুব জরুরি দরকার, বাড়ি থেকে অসুখের খবর এসেছে, আমাকে সামনের শহরটাতে একটু পৌঁছে দেবে?

ড্রাইভার কিছু না বলে মালিকের দিকে তাকালো।

মালিক খেঁকিয়ে উঠে বললো, না না। ওসব হবে না, এখানে হবে না।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিতেই মালিক আবার বলতে লাগলো, ডাকাতের মতন চেহারা, ওসব লোককে একদম বিশ্বাস নেই। রাস্তা থেকে অচেনা লোক কক্ষনো তুলবে না।

রঘু সরদার অস্থির হয়ে উঠলো। মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার দেরি দেখে যদি নীল মানুষ তার খোঁজে ধেয়ে আসে। তবে এ কদিনে একটা ব্যাপার সে বুঝেছে সন্ধের আগে এ নীল মানুষটা জঙ্গল ছেড়ে বেরুতে চায় না।

এদিকে বিকেলের আলো পড়ে আসছে, সন্ধের আর দেরি নেই।

আরও আধ ঘণ্টা পরে একটা ট্রাক এসে থামতেই রঘু সরদার অনেক কাকুতি-মিনতি করে তাতে উঠে পড়লো। ট্রাক ড্রাইভার বললো, দশ টাকা দিতে হবে। রঘু সরদারের কাছে টাকা না থাকলেও সে বলে উঠলো, দেবো, নিশ্চয়ই দেবো। আগে আমাকে পৌঁছে দাও—।

মিনিট দশেক যেতে না যেতেই ট্রাকের গতি কমে এলো। রঘু সরদার জিজ্ঞেস করলো, কী হলো, থামলে কেন ভাই? আমার যে খুব জরুরি দরকার। ট্রাক ড্রাইভার উত্তর দিল, সামনে পথ বন্ধ।

রাস্তাটা সেখানে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরে গেছে। একদিকে ঘন জঙ্গল, আর একদিকে খাদের মতন। চার-পাঁচখানা গাড়ি থেমে আছে সেখানে। এই সব কটা গাড়িকেই রঘু সরদার আগে চলে আসতে দেখেছে। সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে জটলা করছে এক জায়গায়। সামনে রাস্তার ওপরে একটা প্রচণ্ড পাথরের চাঁই পড়ে আছে। সেটা না সরালে কোনো গাড়িই যেতে পারবে না। অত বড় পাথরটা সরানো যাবেই বা কী করে।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। পাশের জঙ্গলে জোনাকি জ্বলেছে। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, তার ফাঁক দিয়ে একটু-একটু করে বেরিয়ে আসছে চাঁদের আলো। জায়গাটা ভারি সুন্দর। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়েও রঘু সরদারের বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। কোনো রকমে একটা শহরে পৌঁছোতে পারলেই সে বেঁচে যেত। ব্রহ্মদৈতাই হোক আর যাই হোক শহরে তাদের জরিজুরি খাটবে না।

পাথরটা সবাই মিলে ঠেলে সরানো যায় না?

এমন সময় পাশের জঙ্গল থেকে সরু গলায় একটা গান শোনা গেল, ‘কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজায় বনে।’

সে গান শুনেই রঘু সরদারের আশ্বারাম খাঁচা-ছাড়া হওয়ার উপক্রম। সবাইকে ঠেলে সে দৌড় লাগালে সামনের দিকে। বড় পাথরের চাঁইটার ওপরে উঠে লাফিয়ে পার হতে যেতেই জঙ্গল থেকে একটা লম্বা হাত বেরিয়ে এলো। তার কাঁধটা ধরে বেড়াল-ছানার মতন শূন্য তুলে সেই হাতটা তাকে নিয়ে গেল। অন্য একটা হাত পাথরটাকে ঠেলে গড়িয়ে দিল পাশের খাদে।

এমন চোখের নিমেষে ঘটনাটা ঘটলো যে, অন্য লোকেরা ভাবলো যে, রঘু সরদারও বোধহয় পাথরটার সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে।

নীল মানুষ রঘু সরদারকে জঙ্গলের মধ্যে নামিয়ে দিল গুটুলির পায়ের কাছে। গুটুলি এখন মুখে দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে অন্য রকম সেক্সি আছে। সে কোমরে হাত দিয়ে চোখ পাকিয়ে বললো, রঘু, আমার পান কোথায়?

নীল মানুষ বললো, এটা তোমার কী রকম ব্যবহার বলো তো, রঘু সরদার? দুপুরবেলা ভাত খাওয়ার পর পান খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, আর এখন সন্ধে হয়ে গেল, তবু তুমি পান নিয়ে এলে না। এখানে কী করছিলে?

রঘু সরদারের মুখে আর কথা নেই। সে বুঝতে পারলো, তার শেষ নিঃশ্বাস ঘনিয়ে এসেছে।

গুটুলি আবার বললো, কী হলো, আমার পান দাও।

রঘু সরদার এবারে বলে ফেললো, পানের দোকান বন্ধ ছিল। তাই আমি শহরে যাচ্ছিলুম পান আনতে।

তাই শুনে গুটুলি হি হি করে হেসে উঠলো, আর নীল মানুষ হেসে উঠলো হা হা করে।

তারপর নীল মানুষ বললো, এসো, একটা জিনিস দেখবে এসো!

আবার সে রঘু সরদারের কাঁধ ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে চললো। গুটুলিকে তুলে নিল অন্য হাতে। অনেক খানি জঙ্গল পেরিয়ে এসে সে এক জায়গায় থেমে বললো, ঐ দ্যাখো। দোকান-সমেত পানওয়ালাকে আমরা নিয়ে এসেছি তোমার জন্য।

এখন অনেকটা জ্যোৎস্না উঠেছে, তাতে দেখা গেল দুটো গাছের সঙ্গে লতাপাতা দিয়ে বাঁধা রয়েছে দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুন্নি। কাছেই পড়ে আছে একটা ছুরি।

পা দিয়ে সেই ছুরিটা ঠেলে দিয়ে নীল মানুষ বললো, এটা দিয়ে ওদের বাঁধন কেটে দাও! ছুরিটা কোথা থেকে এলো জানো? ঐ ন্যাড়াটা ঐ

ছুরি দিয়ে আমার পেট কাঁসাতে এসেছিল। ভোঁতা ছুরি আমার পেটে ঢুকলোই না।

ন্যাড়া গুলগুলি বলতে লাগলো, ডু-ডু-ডু-ডু-ডুত।

আর তার মুখ দিয়ে কেনা বেরিয়ে আসতে লাগলো।

ছুরিটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো রঘু সরদার। প্রায় এক বিঘ্ন লম্বা ঐ ছুরি দিয়ে মানুষের মুণ্ড কেটে ফেলা যায় আর সেই ছুরি নীল মানুষের পেটে ঢোকে নি!

নীল মানুষ আবার বললো, ওদের বাঁধন খুলে দাও, আর পান সাজতে বলো।

রঘু সরদার ওদের বাঁধন কেটে দিতেই ন্যাড়া গুলগুলি ধপাস করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আর দামোদর কাঁপতে লাগলো থরথর করে।

রঘু সরদার বললো, ওরে দামোদর, বাঁচতে চাস তো পান সেজে দে। ওরা যা বলছে কর!

পান সাজার জিনিস-পত্র সব এনে রাখা ছিল, দামোদর সেই রকম কাঁপতে কাঁপতেই দু'খিলি পান সাজলো।

নীল মানুষ বললো, এক খিলি পানে আমার কী হবে? আমার এক সঙ্গে দশটা পান চাই। শিগগির!

তখন আবার পান সাজা হলো। তাড়াতাড়ির জন্য রঘু সরদারও সাহায্য করার জন্য হাত লাগালো।

দুই ডাকাতে মিলে পান সাজছে।

এই বলেই খিলখিল করে হেসে উঠলো গুলুলি। নীল মানুষ বললো, এখন বেশ শান্তশিষ্ট দেখাচ্ছে, না?

এক সঙ্গে দশটা পান মুখে পুরে নীল মানুষ একটা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুললো। তারপর সে রঘু সরদারের দিকে ফিরে বললো, এবারে একটা ঘটনা শোনো! মনে করো, একজন ছোটখাটো চেহারার মানুষ খুব নিরীহ, কারুর সাথে-পাঁচে থাকে না, সে একটা দোকানে চাকরি করে। বেশ দিন কেটে যাচ্ছিল তার। তারপর একজন দুষ্ট লোক সেই দোকানে ডাকাতি করার ষড়যন্ত্র করলো। তারপর ডাকাতি করলোও ঠিক, কিন্তু সব দোষ চাপিয়ে দিল ঐ ছোটখাটো চেহারার নিরীহ লোকটির ওপর। তার ফলে সে মারধোর খেল, তার চাকরিও চলে গেল। এখন এটা খুব অন্যায় কি না বলো? তুমি ডাকাতি করতে চাও, করো। কিন্তু একজন নিরীহ লোকের কাঁধে দোষ চাপাবে কেন? কী, এটা অন্যায় নয়?

রঘু সরদার বললো, হ্যাঁ, অন্যায়, খুব অন্যায়।

নীল মানুষ দামোদরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী বলো?

দামোদরও সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ ওটা খুব অন্যায়।
পরের ওপর দোষ চাপানো মোটেই উচিত নয়।

নীল মানুষ বললো, বাঃ, বাঃ, এই তো চাই। তোমাদের দুজনেরই
তো বেশ ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান আছে, দেখছি।

গুটলি এবারে এক টানে মুখের নকল দাড়ি- গোঁফ খুলে ফেলল বললো,
ওহে দামোদর, আমায় চিনতে পারো? আমিই রঘুনাথপুরের এক মুদিখানায়
চাকরি করতুম, আর তুমি সেই দোকানে ডাকাতি করেছিলে!

দামোদর চোখ কপালে তুলে বললো, অ্যাঁ? অ্যাঁ? ওরে বাপরে, আমার
মহা অন্যায় হয়ে গেছে। আমায় তুমি মাপ করো বামুন ঠাকুর। তোমার
পায়ে পড়ি।

গুটলি চোখ পাকিয়ে বললো, আমি বামুন ঠাকুর নই, আর তোমাকে
মাপও করবো না। অন্যায় করলে তার শাস্তি পেতে হয়, জানো না?

নীল মানুষ বললো, ওহে রঘু সরদার, তুমি আমাদের লোক। তোমার
ওপরেই শাস্তির ভার দিলুম। ওকে কী শাস্তি দেওয়া যায়, বলো তো?

রঘু সরদার নীল মানুষকে খুশী করবার জন্য বললো, মাটিতে গর্ত
করে ওকে বুক পর্যন্ত পুঁতে রাখা উচিত। আর ঐ ন্যাড়া গুলগুলিটা আপনাকে
ছুরি মারতে এসেছিল, ওকেও ঐ শাস্তি দিতে হবে।

নীল মানুষ বললো, ওরে বাবা, এত কঠিন শাস্তি।

গুটলি বললো, আর রঘু সরদার, তুমি যে কথার খেলাপ করে পালাবার
চেষ্টা করেছিলে, তা হলে তোমার কী শাস্তি হবে? তুমি যাতে আর পালাতে
না পারো, সেই জন্য তোমাকেও মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখা উচিত।

নীল মানুষ হা-হা করে হেসে উঠলো, তারপর বললো, তার চেয়ে
বরং এক কাজ করা যাক। ওরা তিনজনেই তিনজনকে শাস্তি দিক।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের মাথায় আটটা করে গাঁট্টা মারুক। নাও, রঘু সরদার
তুমিই শুরু করো।

ন্যাড়া গুলগুলির এর মধ্যে জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে উবু হয়ে স্বল
স্বল করে তাকিয়ে সব কথা শুনছিল। সে তাড়াতাড়ি মাথায় হাত চাপা
দিয়ে বললো, ওরে বাবারে, আমার মাথা ন্যাড়া, গাঁট্টা মারলে আমার
বেশি লাগবে! এটা অন্যায়!

নীল মানুষ বললো, ঠিক আছে, তাহলে গাট্টার বদলে থাণ্ড চলুক।

নাড়া গুলগুলি বললো, আমার গায়ে জোর কম। আমি জোরে থাপ্পড় মারতে পারবো না, আমি চিমটি কাটবো!

নীল মানুষ বললো, ঠিক আছে, তাই সই।

ভারপর শুরু হলো এক মজার ব্যাপার। এ ওকে থাপ্পড় মারে আর এ ওকে চিমটি কাটে। লেগে গেল চ্যাঁচামেচি ঝটাপটি। নীল মানুষ আর গুটুলি হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।

খানিকবাদে যখন প্রায় রক্তারক্তি শুরু হবার উপক্রম, তখন নীল মানুষ হেঁকে বললো, ব্যাস, ব্যাস, যথেষ্ট হয়েছে। নইলে কিন্তু এবারে আমি শুরু করবো!

অমনি সব চুপ।

গুটুলি বললো, রঘু সরদার যে মাটি খোঁড়ার কথা বলছিল, সেটা কিন্তু মন্দ নয়। এই জঙ্গলে বড় জলের কষ্ট। গ্রীষ্মকালে জঙ্গলের জন্তুজনোয়াররাও জলের কষ্ট পায়। ওরা তিনজন এখানকার মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে একটা পুকুর তৈরি করুক না। আমি খন্তা শাবল এনে দেবো!

নীল মানুষ বললো, ভালো আইডিয়া। পুকুরটা পুরোপুরি খোঁড়া হয়ে গেলে আমি সেটার নাম রাখবো রঘু দামোদর গুলগুলি।

দামোদর বললো, আমরা তিনজনে মিলে একটা পুকুর কাটবো? তাতে যে এক বছর লেগে যাবে।

গুটুলি বললো, পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তো অন্তত পাঁচ বছর জেল খাটতে। তার চেয়ে এখানে এক বছর তো বেশ শস্তায় হয়ে গেল! জেলখানার থেকে এখানে ভালো খাবার পাবে। তোমরা নিজেরাই তো রান্না করবে।

নীল মানুষ বললো, খাবারের কথায় মনে পড়ে গেল। বড্ড খিদে পেয়েছে যে? ও রঘু সরদার, আজ কী কী খাওয়াবে? যাও যাও, উনুনে আগুন দাও।

গুটুলি বললো, দামোদর পান সাজো।

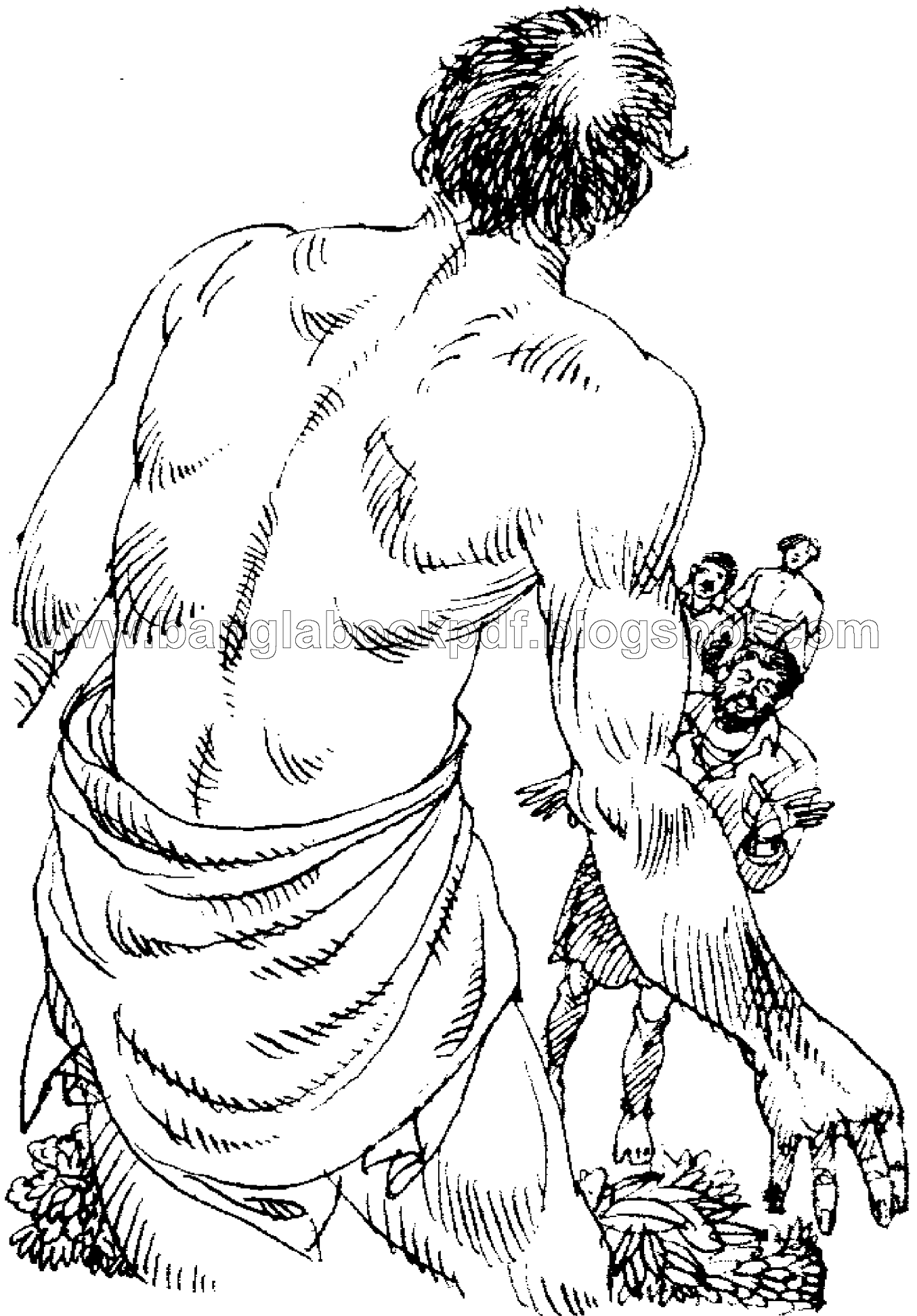
নাড়া গুলিগুলি জিজ্ঞেস করলো, আর আমি কী করবো?

গুটুলি বললো, তুমি মাছ তরকারি কাটবে। তোমার তো ছুরির হাত ভালো।

নীল মানুষ হাসতে হাসতে বললো, আমাদের সংসারটা দিবা বড় হয়ে গেল, কী বলো!

নীল মানুষের মন খারাপ

www.banglabookpdf.blogspot.com



নীল মানুষের মন খারাপ

গভীর জঙ্গল, এখানে মানুষ প্রায় আসেই না, দু' একজন কাঠুরে বা শিকারী দৈবাৎ এসে পড়লেও ভূতের ভয়ে পালিয়ে যায়। লোকের মুখে মুখে রটে গেছে যে, ঐ জঙ্গলে ভূত আছে। কেউ কেউ বলে, ভূত নয়, ব্রহ্মদৈত্য।

এই জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে একটা হাইওয়ে গেছে, সেখান দিয়ে ট্রাক যায়, অন্য গাড়ি যায়। কিন্তু কোনো গাড়ি কখনো থামে না এই জায়গায়। বিশেষত একটা পাহাড়ের গা দিয়ে যখন যেতে হয় তখন ড্রাইভাররা রামনাম জপ করে। ঐ পাহাড়ের আড়াল থেকে দিনে-দুপুরেও একটা প্রকাণ্ড ভূতকে মুখ বাড়তে নাকি দেখেছে কেউ কেউ।

সেই ভূত আসলে নীল মানুষ।

জঙ্গলের মধ্যে সংসার পেতে নীল মানুষ এমনিতে বেশ ভালোই আছে। তার ছোট্ট বন্ধু গুটুলি নানা রকম মজার কথা বলে। রঘু দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি। এরা কুটনো কোটে, রান্না করে, বাসন মাজে, পা টিপে দেয়। ঐ তিনজনকে দিয়ে গুটুলি আবার একটা পুকুরও কাটাচ্ছে। ওরা খস্কা শাবল নিয়ে রোজ সকালে কয়েক ঘণ্টা করে পুকুর খোঁড়ার কাজ করে, কাছে দাঁড়িয়ে গুটুলি খবরদারি করে ওদের ওপর।

রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি আগে ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত। এখন তারা নীল মানুষের চেয়ে গুটুলিকেও কম ভয় পায় না। গুটুলির গাঁটে-গাঁটে বুদ্ধি। এর মধ্যে ওরা পাঁচবার পালাবার চেষ্টা করেছে। পাঁচবারই গুটুলির বুদ্ধিতে ধরা পড়ে গেছে। প্রত্যেকবার ধরা পড়লেই ওদের শাস্তির মেয়াদ বেড়ে যায়।

সব কিছুই ঠিকঠাক চলছে, তবু এক-একদিন নীল মানুষ ছটফট করে ওঠে। মাজিতে চিংপাত হয়ে শুয়ে সে কান্না-কান্না গলায় বলে, গুটুলি, ও গুটুলি! আমার কিছু ভালো লাগছে না।

গুটুলি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন, তোমার কী হলো, নীল মানুষ? শরীর খারাপ লাগছে?

নীল মানুষ একটা ঝড়ের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দিল, শরীর নয় মন! আমার তো কখনো শরীর খারাপ হয় না।

গুটুলি জিজ্ঞেস করলো, কেন তোমার মন খারাপ লাগছে? নতুন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে?

নীল মানুষ বললো, ধুং! খাওয়ার কথা কে বলছে। দিনের পর দিন জঙ্গলে পড়ে থাকতে কারুর ভালো লাগে?

গুটুলি বললো, আমার তো খুব ভালো লাগে। আমি এত বেঁটে বলে শহরে গেলেই লোকে আমাকে ঠাট্টা করে মাথায় চাঁটি মারে, আমার জিনিসপত্র কেড়ে নেয়। তার চেয়ে এই জঙ্গলই বেশ ভালো।

নীল মানুষ বললো, বেঁটে বলে তোমায় দেখে সবাই ঠাট্টা করে আর এত লম্বা বলে আমায় দেখে সবাই ভয় পায়। কিন্তু আমি তো লেখাপড়া শিখেছি। আমার ইচ্ছে করে শহরে গিয়ে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে, গান শুনতে, লোকজনের সঙ্গে মিশতে।

গুটুলি বললো, সে আর তুমি এজন্মে পারবে না। তুমি তো শুধু লম্বা নও, তুমি যে তালগাছ। তুমি এখনও রোজ-রোজ লম্বা হচ্ছে। তোমায় আমি প্রথম যে-রকম দেখেছিলুম, তার চেয়েও তুমি এখন বেশি লম্বা হয়ে গেছ। মাপলে বোধহয় দশ ফুটেরও বেশি হবে। তার ওপরে তোমার গায়ের রং একেবারে আকাশের মতন নীল, এমনকি তোমার জিভটা পর্যন্ত নীল! তোমায় দেখলে তো মানুষ ভয় পাবেই।

—আমি যদি শহরে গিয়ে সবার সামনে হাত জোড় করে বলি, ওগো, যদিও আমার শরীরটা এত লম্বা আর গায়ের রংটা অন্য রকম, কিন্তু আমি তোমাদের মতনই সাধারণ মানুষ! আমি কারুর ক্ষতি করতে চাই না!

—তোমার কথা শোনবার আগেই সবাই ভয়ে পালাবে। কিংবা শুনলেও বুঝতে পারবে না। তোমার গলার আওয়াজটা যে এখন জয়ঢাকের মতন হয়ে গেছে। আমিই শুধু বুঝতে পারি।

—যদি ফিসফিস করে বলি? হাঁটু গেড়ে বসে সবার কাছে ক্ষমা চাই?

—তা হলে ওরা তোমাকে বেঁধে চিড়িয়াখানায় ভরে দেবে!

—কেন?

—তোমাকে আর কেউ মানুষ বলে মানবে না! জানলে, অন্য কোনো জন্তু!

নীল মানুষ পাশ ঘিরে হ হ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, ওহো হো, কেন আমায় মানুষ বলে মানবে না? আমি মানুষ, মানুষ! ওহো হো, কতদিন ফুটবল খেলা দেখিনি। কতদিন ফুটবল খেলিনি! একসময় আমি ফুটবল খেলতে কী ভালোই না বাসতাম।

নীল মানুষের দু'চোখ দিয়ে বলের জলের মতন গলগল করে কান্না বরতে লাগলো।

গুটুলি একটা গামছা দিয়ে তার চোখ মুছে দিতে দিতে বললো, আজ, কেঁদো না, কেঁদো না! লক্ষ্মী ছেলে, তোমার জন্য আমি ফুটবল এনে দেবো। তুমি এইখানেই ফুটবল খেলবে!

নীল মীনুয় কোঁপাতে কোঁপাতে বললো, কার সঙ্গে খেলবো? একা-একা বুঝি ফুটবল খেলা যায়!

—ঐ রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি খেলবে তোমার সঙ্গে।

—দূর দূর, ওরা তো ডাকাত, ওরা ফুটবল খেলার কী জানে?

—একেবারে জন্ম থেকেই তো ডাকাতি শুরু করেনি। ছোটবেলায় ফুটবল খেলেছে নিশ্চয়ই!

—যারা ছোটবেলায় ফুটবল খেলে, তারা বড় হয়ে কখনো ডাকাত হয় না। ফুটবল খেললে মন ভালো হয়ে যায়।

—ওদের ডেকে জিজ্ঞেসই করা যাক না, ওরা ফুটবল খেলা জানে কি না!

ডাকা হলো রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলিকে। ওরা জল-কাদা মাখা হাত-পা নিয়ে লাইন করে দাঁড়ালো সামনে।

নীল মানুষ শুয়েই আছে মাটিতে। গুটুলি একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে জিজ্ঞেস করলে, অ্যাঁই, তোরা কেউ ফুটবল খেলা জানিস?

হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন শুনে ডাবচাকা খেয়ে গেল তিন ডাকাত। এ ওর মুখের দিকে তাকালো। হ্যাঁ কিংবা না কোন উত্তরটা দিলে ভালো হবে, তাই-ই বুঝতে পারছে না।

ন্যাড়া গুলগুলি কস্ করে বলে ফেললো, হ্যাঁ। আমি অনেক ফুটবল খেলেছি। এ-গ্রামে-ও গ্রামে খেলতে গেছি। কত গোল দিয়েছি!

গুটুলি চোখ পাকিয়ে বললো, তা হলে লোকের পেটে ছুরি মারতে শিখি কখন?

ন্যাড়া গুলগুলি লজ্জা পেয়ে কান চুলকে বললো, সে আমাকে অন্য একজন গুরু শিখিয়েছিল। কিন্তু ফুটবল খেলা অনেক ভালোই জানি!

দামোদরই বা কম যাবে কেন। সে ঠোঁট উল্টে বললো, ফুটবল মানে ঐ গোল-গোল বলে লাখি মারা তো? সে আমি অনেক লাখিয়েছি।

রঘু ওদের চেয়ে আর-একটু বড় ডাকাত। সে বললো, ওরা আর কী খেলেছে। আমি আমাদের গ্রামে খেলুড়ে দলের সদস্য ছিলাম। আমার দলকে খেলার জন্য কত জায়গা থেকে ডেকে নিয়ে যেত। সে অবশ্য গোঁপ-দাড়ি ওঠবার আগের কথা।

গুটুলি বললো, আর গোঁপ-দাড়ি গজাবার পর থেকেই বুঝি ডাকাতি শুরু করনি!

রঘু লজ্জা পেয়ে জিভ কেটে বললো, বারবার ঐ কথা বলে লজ্জা দাও কেন, গুটুলি দাদা! সে সব তো এখন ছেড়ে দিয়েছি।

গুটুলি বললো, ছেড়ে দিয়েছিস, না, সুযোগ পাস না! যাক্ গে, যা, এখন পুকুর কাটেতে যা। এই নিয়ে পরে আবার কথা হবে!

ওরা চলে যাবার পর গুটুলি নীল মানুষকে বললো, তা হল দেবলে তো? ওরা তিনজনেই একসময় খেলেছে বললো। আমি আজই বল যোগাড় করছি। তুমি খেলার মাঠটা ঠিক করবে, চলো। ওঠো, ওঠো, ওরকম মন খারাপ করে শুয়ে থাকতে নেই।

পাহাড়ের একপাশে খানিকটা ঢালু জায়গা। প্রায় সমতলই বলা যায়, মাঝে মাঝে কয়েকটা ছোটখাটো গাছ রয়েছে। সেই জায়গাটা পছন্দ হলো দু'জনেরই। নীল মানুষ পটপট করে গাছগুলো উপড়ে ফেললো। শুধু মাঠের দু'ধারে ছোট গাছ রইলো। সেই দুটো হবে গোল পোস্ট!

গুটুলি বললো, আজ রাতেই আমি বল যোগাড় করে আনছি। কাল খেলা হবে। আজ ভালো করে ঝেঁয়ে দেয়ে ঘুমোও, মন খারাপ করে থেকো না। মন খারাপ থাকলে ভালো করে খেলা যায় না।

বিকেলের দিকে রঘু আর দামোদরকে নিয়ে গুটুলি চলে গেল শহরে। যাবার পথে গুটুলি বললো, এই ভোরা আবার যেন পালাবার চেষ্টা করিস না। তাহলে এবার কিন্তু ধরে এনে কান কেটে দেবো!

দামোদর বললো, আরে ছি ছি, এখন পুকুর কাটা বন্ধ রেখে ফুটবল খেলতে বলছো, এখন কেউ পালায়? খেলাটা কত আমাদের জিনিস!

রঘু বললো, এক ছিমবে জঙ্গলে আটকে রেখে তুমি আমাদের উপকারই করছো, গুটুলি দাদা। বছর খানেক এখানে থাকলে পুলিশ আমাদের কথা

ভুলে যাবে। তখন নিশ্চিতভাবে কেরা যাবে, কী হলো?

ভুলল থেকে ওরা একটা ইরিশ মেয়ের এনেছিল, শহরে এসে সেই মাংস বিক্রি করে যা টাকা পাওয়া গেল, তাতে ফুটবল কেনা হলো, আরও চা-বিস্কুট, নুন-মশলা, অন্য খাবার-দ্রব্য কেনা হলো।

খেলা আরম্ভ হলো পরের দিন সকালে। বেশ সুন্দর যৌব উঠেছে, বেশি জোর হাওয়া নেই, ফুটবল খেলার পক্ষে বেশ ভালো দিন। একদিকে নীল মানুষ, আর একদিকে তিন ডাকাত। গুলি হলো বেকারি। সে একটা হাইশুলও কিনে এনেছে।

নাড়া গুলগুলি কিছুতেই সামনে আসতে চায় না, সে দায়োদের পেছনে লুকোচ্ছে। দায়োদর তাকে বলছে, এই ঠেলহিস কেন, আমাকে ঠেলহিস কেন? যশু বুক ফুলিয়ে বললো, তোরা মোজা দাঁড়া, অদমে থেকেই তর পাখিস কেন?

মাঝখানে বলটা রেখে গুলি হাইশুল বাজাতেই তিন ডাকাত নিছিয়ে গেল অমনকটা। তারা নীল মানুষের কাছাকাছি গিয়ে বল পা ছোঁরাতে সাহস পায়নি!

গুলি হামক দিয়ে বললো, ও কি হচ্ছে! মন দিয়ে খেলবি সবাই। নীল মানুষ বলে একটা শটে লাগলো।

অমনি সেটা চোখের নিম্নে প্রায় উড়ে গেল পাশাড় পেরিয়ে!

তিন ডাকাত হাঁ করে ওপরের দিকে চেয়ে রইলো। নীল মানুষ বললো, যাঃ, ও কি হলো? বলটা চলে গেল।

গুলি বললো, তাতে চিন্তার কিছু নেই। আমি আরও বল এনে রেখেছি। চিন্তার কিছু নেই। তবে, নীল মানুষ, একটু আশু খেলো। ফুটবল খেলাটা তো আর গায়ের জোরের বাণীর নয়। একটু আশু!

আর একটা বল সে যশুদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, এইবার তোমাদের দিক থেকে যারো!

যশু বললো, দায়োদর, তুই মারবি নাকি?

দায়োদর বললো, নাড়া গুলগুলিকে দাও। ও ভালো খেলে, বলেছিল।

নাড়া গুলগুলি বললো, আমার বল ঐ দৈত্যের গায়ে লাগলে যদি দুগ চটে যায়? ও সবের মধ্যে আমি নেই।

দায়োদর যশুকে বললো, ওহাঃ, তুমি আমাদের সবার, প্রথম বলটা তুমিই মারবে।

রঘু বললো, তোরা সব ভীতুর ডিম। দ্যাখ, আমি কেমন মারতে পারি।
এটা হচ্ছে খেলা।

সাধারণ মানুষের তুলনায় রঘুর গায়ে বেশ জোর। সে কবে একটা
ফ্রি কিক্ খাড়লো বলটাকে, সেটাও বেশ অনেক উঁচুতে উঠলো।

নীল মানুষ খুশি হয়ে বললো, যাঃ যাঃ, এই তো চাই!

সে লাফিয়ে হেড করতে গেল বলটাকে। তার মাথায় লেগেই বলটা
ফটাস করে ফেটে গেল।

নীল মানুষ বললো, ঐ যাঃ, কী হলো?

গুটলি বললো, তাতে কিছু হয়নি, তাতে কিছু হয়নি। আরও বল আছে।
কিন্তু তোমার আবার লাফিয়ে হেড করার কী দরকার ছিল, বলটা তো
এমনিই এসে তোমার মাথায় লাগতো!

আর একটা বল সে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, এবারে একটু আস্তে মারো,
নিচু করে মারো!

নীল মানুষ বললো, এবারে, খুব আস্তে, আলতো করে মারবো। এই
দ্যাখো।

বলটা সে নিচু করে মারলো ঠিকই, সেটা এসে লাগলো রঘুর পেটে,
কিন্তু তাতে বলটা ধামলো না। রঘু বলটা সমেত উড়ে গিয়ে ধাক্কা খেল
পেছনের গোল পোস্ট গাছটার। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

দামোদর আর ন্যাভা গুলহুদিও মাটিতে শুয়ে পড়ে চাঁচাতে লাগলো,
ওরে বাবারে, আমরা আর খেলবো না, আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা
পুকুর কাটবো, ফুটবল খেলতে পারবো না। ওরে বাবা রে....

নীল মানুষ গুটলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, এটা আমার গোল
হয়েছে, না, হয়নি?

গুটলি তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বললো, তুমি বড্ড ফাউল করো! আর
খেলা হবে না। দেখি, রঘু বেচারার কী হলো!

আর খেলা হবে না? আর খেলা হবে না—বলতে বলতে নীল মানুষ
হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। তারপর মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে কাঁদতে
কাঁদতে বলতে লাগলো, খেলা হলো না, খেলা হলো না আমার! কিছু
ডালো লাগে না!

রঘুর মাথায় জল ঢেলে তার জ্ঞান ফেরানো হলো। তারপর তিন ডাকাতই
দৌড়ে খেলার মাঠ ছেড়ে পুকুর কাটতে চলে গেল স্বৈচ্ছায়।

সেই থেকে নীল মানুষের আরও মন খারাপ হয়ে গেল। সে কিছু খেতেও

চায় না, কারুর সঙ্গে কথাও বলে না। শুধু গাছতলায় শুয়ে শুয়ে কাঁদে।

গুটুলি তিন ডাকাতকে ধমক দিয়ে বললো, হি হি, হি, তোরা কী বলতো! তোরা কি মানুষ! ছেলেটা একটু ফুটবল খেলতে চেয়েছিল, তোরা তাও খেলতে পারলি না? এই মুরোদ নিয়ে তোরা ডাকাত হয়েছিসি?

রঘু আর দামোদর লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলো। ন্যাড়া গুলগুলি হাত জোড় করে বললো, দাদা, আর যা করতে বলো সব পারবো, কিন্তু ঐ খেলার কথা উচ্চারণ করো না। বাবারে, এখনও আমার বুক কাঁপছে!

পরপর দু'দিন নীল মানুষ কিছু না খেয়ে রইলো আর কাঁদলো। গুটুলির কোনো কথাও সে শোনে না।

গুটুলি দেখলো, এই রকম ভাবে আর কয়েকদিন চললে তো মহাবিপদ হবে। না খেয়ে নীল মানুষ খুব দুর্বল হয়ে যাবে আর সেই সুযোগে রঘু-দামোদরেরা যদি পালাবার চেষ্টা করে, তখন আর তাদের আটকানো যাবে না। এমনকি, ওরা তখন নীল মানুষকে মেরে ফেলারও ব্যবস্থা করতে পারে।

সে তখন নীল মানুষের কানের কাছে মুখ এনে বললো, তোমার নিজের খেলা তো হলো না। কিন্তু তুমি ফুটবল খেলা দেখবে বলেছিলে, চলো, আমরা শহরে ফুটবল খেলা দেখতে যাবো! শহরে যাবো!

নীল মানুষ বললো, আমি শহরে গেলে আর কেউ খেলবে! সবাই তো ভয়ে পালাবে!

গুটুলি বললো, সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও! আমি যদি তোমায় ফুটবল খেলা দেখাতে না পারি, তা হলে আমার নামে তুমি কুকুর পুষো। আমি আর কোনোদিন তোমার কাছে মুখ দেখাতে আসবো না! এখন ওঠো, উঠে চাউ খেয়ে নাও তো, লক্ষ্মীটি!

নীল মানুষ তখন ভূমিশয়া ছেড়ে উঠলো। নদীতে গিয়ে স্নান করলো। তারপর দু'দিনের খাওয়া একসঙ্গে খেয়ে মেঘ-গর্জনের মতন একটা ঢেকুর তুলে বললো, আঃ! এবার দশ খিলি পান দাও তো।

তিন ডাকাত সঙ্গে সঙ্গে পান সাজতে বসলো।

কিন্তু কী করে যে নীল মানুষকে ফুটবল খেলা দেখানো হবে, তা আর গুটুলির মাথায় আসে না। যে-শহরটায় তারা জিনিসপত্রের কেনাকাটি করতে যায়, সেখানে মাঝে মাঝে ফুটবল খেলা হয় বটে। বাইরের টিমও খেলতে আসে। কিন্তু ফুটবল খেলা তো আর রাস্তিরে হয় না। দিনের আলো থাকতে থাকতেই শেষ হয়ে যায়। দিনের আলোয় নীল মানুষকে নিয়ে কোই শহরে

যাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। নীল মানুষকে দেখলেই সবাই বাড়িঘর ছেড়ে পালাবে।

একদিন যায়, দু'দিন যায়, তিন দিন যায়। নীল মানুষ রোজই জিজ্ঞেস করে, কী গো গুটুলি, আমার ফুটবল খেলা দেখার কী হলো?

গুটুলি হাত তুলে বলে, হবে, হবে, ঠিকই হবে, আমাকে একটু সময় দাও!

জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে যে হাইওয়েটা গেছে, গুটুলি প্রায় সেই রাস্তাটার কাছে গিয়ে একটা পাথরের আড়ালে বসে থাকে। কত রকম গাড়ি যায়, সে লক্ষ্য করে। ট্রাক, মোটর গাড়ি, বাস। কত রকম মানুষ। কেউ এই জায়গাটার খামে না।

একদিন সকালে একটা ট্রাকে করে একদল ছেলে যাচ্ছে, হঠাৎ তারা দেখলো, রাস্তার মাঝখানে একটা বড় পাথরের চাঁই। ট্রাকটা আর যেতে পারবে না। ছেলের দল হৈ হৈ করে উঠলো। গতকাল বিকেলে তারা এই পথ দিয়ে গেছে, তখন এরকম কোনো পাথর ছিল না। তারা ড্রাইভারকে বললো, ব্যাক করো। ব্যাক করো। গাড়ি ঘোরাও। এটা ভূতের জায়গা!

ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে দেখলো, পেছন দিকেও রাস্তায় এখন ঐ রকম আর একটা পাথর। সেদিকেও যাবার উপায় নেই।
ছেলেরা তখন ট্রাক থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে সবাই মিলে একটা পাথর ঠেলে সরাবার চেষ্টা করলো।

তখন একটা হুইশ্ল বেজে উঠলো। রেফারির পোশাকে একটা ফুটবল বগলে নিয়ে গুটুলি হাজির হলো সেখানে। এক হাত তুলে হাসিমুখে সে বললো, ওহে ছেলের দল, আজ তোমাদের এখানে নেমস্তন্ন। তোমরা তো শহরে ফুটবল খেলতে গিয়েছিলে, এবারে আমাদের টিমের সঙ্গে একটা ম্যাচ খেলে যাও!

কয়েকটা ছেলে চৌচিয়ে উঠলো, ভূত! ভূত! এই তো সেই ভূত!

আর কয়েকটা ছেলে বলল, দূর, এ তো একটা বেঁটে বাটকুল। এ ভূত হলেও একে আমরা পরোয়া করি না।

গুটুলি বললো, ভূত-টুত কিছু নেই। তোমরা এই জঙ্গলের মধ্যে এসে একটা ম্যাচ খেলবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া করবে। ফিরে এসে দেখবে রাস্তা পরিষ্কার! এসো, ভয় পাচ্ছে কেন?

ঐ ছেলেদের যে ক্যাপ্টেন, সে বললো, খেলার ব্যাপারে আমাদের কেউ চ্যালেঞ্জ জানালে মোটেই ভয় পাই না। চুনী গোস্বামী, পি কে ব্যানার্জি

হলো ও ঝড়ে যেতে রাজি আছি। তোমাদের কেমন টিম, বলো তো দেখি।
রাস্তা ছেড়ে ওরা ঢুকে এলো বনের মধ্যে। গুটুলি ওদের পথ দেখিয়ে
নিয়ে এলো খেলার মাঠে।

ক্যাপ্টেন বললো, কই, তোমাদের খেলোয়াড় কোথায়?

গুটুলি আর একটা হুইশল বাজাতেই বেরিয়ে এলো রঘু, দামোদর আর
ন্যাড়া গুলগুলি। তারা পরেছে হাক প্যাঁক আর গেঞ্জি। তারা মার্চ করে
গিয়ে দাঁড়ালো মাঠের এক দিকে।

এদিকের ক্যাপ্টেন অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, এই তোমাদের টিম! আর
খেলোয়াড় কই?

গুটুলি বললো, আগে এই টিমকেই হারাও দেখি, তারপর আমার অন্য
টিম বার করবো!

ক্যাপ্টেন বললো, তুমি কে হে-বাপু? এই জঙ্গলের মধ্যে শুধু-শুধু
আমাদের আটকিয়ে এখানে নিয়ে এলে? আমাদের ক্লাবের নাম ইন্ডিয়ান
বুলেটস! আমরা এই জেলার চ্যাম্পিয়ন! এই তিনটে লোকের সঙ্গে আমরা
কী খেলবো? এ তো ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ!

ওদিক থেকে রঘু সর্দার বললো, ওহে, খুব যে বড়-বড় কথা বলছো?
খেলোই দেখো না, ক'টা গোল দিতে পারো!

ক্যাপ্টেন বললো, এগারো মিনিটে বাইশটা গোল দেবো, দেখবে?

গুটুলি বলটা মাঠের মাঝখানে ছুঁড়ে দিতেই ক্যাপ্টেন একাই বলটা নিয়ে
ড্রিবল করতে করতে, রঘু দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলিকে তিনটে লাং
মেরে শুইয়ে দিয়ে ওপাশের গাছটার গায়ে বলটা ঠেকিয়ে বললো, এই
নাও এক গোল!

অমনি কোথায় যেন ধূপ ধাপ ধূপ ধাপ শব্দ হলো?

ক্যাপ্টেন চমকে উঠে বললো, ওকি? ও কিসের শব্দ!

গুটুলি বললো, ও কিছু না, ও কিছু না, আমাদের একজন সাপোর্টার
হাততালি দিচ্ছে!

ক্যাপ্টেনের মুখখানা হাঁ হয়ে গেল, সে বললো, ঐ আওয়াজ, ঐ তোমাদের
সাপোর্টারের হাততালি? কোথায় তোমাদের সেই সাপোর্টার?

গুটুলি বললো, ও নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। নাও-নাও,
আবার খেলা শুরু করো।

ক্যাপ্টেন ফিরে এসে আর একজনকে বললো, নে, এবার তুই গোল
দিয়ে আয়!

দ্বিতীয় গোলটা অবশ্য তত সহজে হলো না। দামোদর-রঘু-ন্যাড়া গুলগুলি যথেষ্ট ফাইট দিল, এমনকি ন্যাড়া গুলগুলি বলটা পায়ে নিয়ে এদের দিকে অনেকটা এগিয়েও এসেছিল, কিন্তু হঠাৎ মেঘের ডাকের মতন বাঃ বাঃ শব্দ শুনেই সে এমন চমকে গেল যে বল বেরিয়ে গেল তার পা থেকে। এবারেও তারা গোল খেল।

এইরকম ভাবে পরপর এগারোটা গোল খাবার পর এদিককার ক্যাপ্টেন বললো, গোল খেয়ে পেট ভরেছে, না, আরও চাও?

রঘু সর্দার বললো, আর চাই না। যথেষ্ট হয়েছে। কী বলো গুটুলিদা?

গুটুলি বললো, হ্যাঁ, এবারে তোমরা সরে যাও। এবারে আমাদের আর একজন খেলোয়াড় আসবে। তোমরা তার সঙ্গে একটু খেলে দ্যাখো তো বাপু!

গুটুলি আবার হুইশ্লে বাজাতেই গাছপালার আড়াল থেকে এক লাফে এসে হাজির হলো নীল মানুষ। তার মাপের তো কোনো প্যান্ট হয় না। তাই সে একটা ধুতি মালকোছা মেরে পরেছে। আর খালি গা। সে এসেই হাত জোড় করে বললো, বেশি জোরে বল মারবো না। খুব আস্তে আস্তে, কোনো ভয় নেই!

কিন্তু তার কথা কে শুনবে। ওদিককার এগারো জন খেলোয়াড়ই অজ্ঞান।

নীল মানুষ বললো, এ কী হলো? আর খেলা হবে না? ওদের গোল শোধ দেওয়া হবে না?

গুটুলি এক ডজন ফুটবল নিয়ে এসে বললো, খেলা দেখার শখ ছিল, সে শখ তো মিটেছে? এ নাও, এবারে একটা একটা করে মারো, ওদের গোল শোধ করে দাও।

পরপর বারোখানা বলে কিক্ কয়িয়ে ওপারে পাঠিয়ে নীল মানুষ হাসি মুখে বললো, শোধ দেবার পরেও একখানা বেশি!

গুটুলি বললো, যথেষ্ট হয়েছে। এবারে তুমি রাস্তার ওপরের পাথর দুটো সরিয়ে দিয়ে এসো। আমি এই ছেলেগুলোর জলখাবারের ব্যবস্থা করি।

নীল মানুষ খুশি মনে লাফাতে লাফাতে চলে গেল রাস্তার দিকে।

নীল মানুষের পরাজয়

www.banglabookpdf.blogspot.com



নীল মানুষের পরাজয়

শেষরাতের দিকে দারুণ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হলো হঠাৎ। শীতকাল, এ সময় এরকম বাদলা হওয়ার কথা নয়। রণজয় আর গুটুলির ঘুম ভেঙে গেল। পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট-মতন গুহাকে ওরা বড়ো করে নিয়েছে, সেটাই এখন ওদের বাড়ি। রণজয় অন্য জায়গা থেকে একটা বড়ো পাথর এনে গুহার মুখটা আড়াল করে রেখেছে, বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না।

ঝড়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যাবার পর গুটুলি প্রথমে উঠে এসে বাইরে একটু উঁকি মারলো। মড় মড় করে গাছ-ভাঙার শব্দ হচ্ছে, বাতাসেও একটা গোঁ-গোঁ শব্দ। এরকম ঝড়-বৃষ্টি গুটুলি সাতজন্মে দেখেনি। সে ভয় পেয়ে ভেতরে ছুটে এসে রণজয়কে ডাকলো।

রণজয়ের ঘুম ভেঙে গেলেও সে সহজে উঠতে চায় না। বেশ শীত পড়েছে, সে কম্বলটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বললো, বৃষ্টি পড়ছে, তাতে ভয়ের কী আছে? আমাদের গুহার মধ্যে তো আর জল ঢুকবে না!

গুটুলি বললো, কী রকম ভয়ংকর একটা শব্দ হচ্ছে। বাইরে এসে একবার শুনে দ্যাখো! মনে হচ্ছে যেন মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে। যদি সারা পৃথিবী ভেসে যায়!

রণজয় তাক্সিলোর সঙ্গে বললো, হেঃ, পৃথিবী ভাসলেই হলো আর কী! এখন ঘুমোও। সকালে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

এই সময় বাইরে যেন একসঙ্গে একশোটা কামান ফাটার শব্দ এলো। গুটুলি রণজয়ের হাত চেপে ধরে কাঁদো-কাঁদো গলায় বললো, ও কী! ও কী? পাহাড় ভেঙে পড়ছে!

রণজয় হেসে বললো, এত ভয় किसের, গুটুলি ভায়া? বাজের আওয়াজ শোনোনি কখনো?

এত জোরে বাজ পড়ে কখনো ?

আমরা গুহার মধ্যে বয়েছি তো, তাই আওয়াজটা বেশি মনে হচ্ছে।
ঠিক আছে, চলো দেখি বাইরে। রঘু কোথায় ?

রঘু কাঁদছে!

রণজয়কে এবারে উঠতেই হলো। গুহাটা অনেকখানি লম্বা ভেতরে দু'তিনটে ঘরের মতন খোপ-খোপ। তারই একটা খোপে ওদের রান্নাঘর, সেইখানেই থাকে রঘু। শীতের জন্য সেই ঘরটায় আগুন জালিয়ে রাখা হয়েছে।

রণজয় আর গুটুলি সেই ঘরে এসে দেখলো, রঘু দেয়ালে পিঠ দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে আর বলছে, আজ শেষ হয়ে গেলুম! আজ আকাশ ভেঙে পড়বে, পাহাড় ভেঙে পড়বে, আর কোনদিন বাড়ির লোকদের দেখতে পাবো না গো!

রণজয় বললো, দেশের কী অবস্থা! ডাকাতগুলো পর্যন্ত এত ভীতু হয়? এই রঘু, চল, আমার সঙ্গে বাইরে চল, একটু বৃষ্টিতে ভিজ্ঞে আসি!

এই সময় মেঝেটা একটু কঁপে উঠলো আর বাইরে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো।

গুটুলি দারুণ ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠলো, ভূমিকম্প শুরু হয়েছে! মহাপ্রলয়!

রণজয় এবারে খুব দ্রুত গুটুলি আর রঘুকে দু'হাতে তুলে নিয়ে ছুটে চলে এলো বাইরে। ভূমিকম্প হলে গুহার মধ্যে থাকা সত্যিই বিপজ্জনক। বাইরে বৃষ্টি একেবারে চাবুকের মতন। একের পর এক গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ হচ্ছে। কাছেই একটা ছোট পুকুর আছে, তার পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। রঘু আর গুটুলিকে দুটি বেড়ালছানার মতন দু'বগলে নিয়ে রণজয় ছুটলো সেদিকে।

পুকুরটার ধারে পৌঁছোতেই হঠাৎ খুব জোরে একটা বিদ্যুৎ চমকে চতুর্দিক সাদা হয়ে গেল। রণজয় মুখ তুলে আকাশটা দেখবার চেষ্টা করেও পারলো না। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

রণজয়ের যখন জ্ঞান ফিরলো, তখন ঝড়-বৃষ্টির কোনো চিহ্ন নেই। দিনের আলো ফুটে গেছে। রণজয় ধড়মড় করে উঠে বসলো। কী হয়েছিল কাল রাত্তিরে? ভূমিকম্প পৃথিবী চৌচির হয়নি, পাহাড়ও ভেঙে পড়েনি, তবু শুধু বিদ্যুৎ চমকে সে অজ্ঞান হয়ে গেল কেন? তার মাথায় কি বাজ পড়েছিল? মাথায় বাজ পড়লে কি কেউ বাঁচে?

রণজয় নিজের দু'গালে চড় মারলো কয়েকটা। বাথা লাগছে তো। জ্বা
হলে সে মরেনি। গুটুলি আর রঘু তার দু'পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।
পুকুর থেকে আজলা করে জল এনে রণজয় ছিটিয়ে দিল ওদের মুখে।
একটু বাদেই ওদেরও জ্ঞান ফিরলো।

রঘু চোখ মেনেই বললো, আমি কি মরে গেছি?

গুটুলি বললো, আমার কী হয়েছিল?

রণজয় বললো, ঝড়ে শুধু কয়েকটা গাছ ভেঙে পড়েছে, আর কিছুই
হয়নি। সামান্য একটু মাটি কঁপেছিল। রঘু, যা, উনুনে আগুন দে। চা
আর রুটি বানা, আমার খিদে পেয়েছে!

রঘু আবার কাঁদতে শুরু করে দিল ভেউ ভেউ করে।

রণজয় অবাক হয়ে বললো, আরে, এ ডাকাতটা দেখছি বাচ্চাদেরও
অধম হয়ে গেছে। এই, তোর এখন আবার কান্নার কী হলো?

রঘু বললো, আমি দোষ করেছি বটে, তা বলে কি কোনোদিন ছুটি
পাবো না?

গুটুলি বললো, কতগুলো ডাকাতি করেছিলি মনে নেই। তোকে যদি
পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতুম, তা হলে সারাজীবন জেলে পচতে হতো!

রঘু বললো, রোজ রোজ রান্না করার চেয়ে জেলে থাকাও ভালো!

রণজয় ধমক দিয়ে বললো, যা, আগে চা-টা তৈরি কর। আমরা গুহায়
আসছি একটু বাদে।

রঘু চলে যাবার পর গুটুলি বললো, ওস্তাদ, দাখো, আকাশ এখন
একেবারে পরিষ্কার। গতকাল বিকেলেও এরকম পরিষ্কার ছিল। তবু রাতিরে
ওরকম ঝড়-বৃষ্টি হলো কী করে? আমরাই বা অজ্ঞান হয়ে গেলুম কেন?

রণজয় বললো, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে.....

সে কথা শেষ করার আগেই পেছনে শোনা গেল মানুষের পায়ে শব্দ।
ওরা পেছন ফিরতেই দেখলো, দুটি কিশোরী মেয়ে পুকুরটার দিকে আসছে।

মেয়ে দুটিকে একেবারে হুবহু একরকম দেখতে। দু'জনেরই বয়েস হবে
তের চোদ্দ, মাথায় লম্বা চুল, একজন একটা লাল রঙের, অন্যজন একটা
হলদে ফ্রক পরা। দু'জনেরই কাঁধে ঝোলা-ব্যাগ। দু'জনেরই পায়ে হাঁটু
পর্যন্ত ঢাকা জুতো।

ওরা যেমন মেয়ে দুটিকে দেখে অবাক হয়েছে, তেমনি মেয়ে দুটিও
ওদের দেখে অবাক ভাবে থমকে দাঁড়ালো। রণজয় প্রায় আট ফুট লম্বা,
গায়ের রং আকাশের মতন নীল, আর গুটুলিকে দেখতে একটি বাচ্চা

ছেলের মতন ছলেও তার নাকের নিচে পুরুট্ট গোঁস।

বণজয় আর গুটুলিকে দেখার পর মেয়ে দুটি একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগলো।

বণজয়ের গলার আওয়াজ বাজসাই ধরনের, নতুন লোকেরা শুনে চমকে যায়। তাই সে গুটুলির চোখের দিকে তাকিয়ে একটি ইঙ্গিত করল।

গুটুলি জিজ্ঞেস করলো, এই, তোমরা কারা গো? এই মনে কী করে এলে?

হাসি থামিয়ে লাল রঙের ফ্রক-পরা মেয়েটি তার কোলা থেকে একটি ছোট্ট টেপ রেকর্ডার বার করে কানের কাছে এনে কী যেন শুনলো। তারপর সেটা অন্য মেয়েটির হাতে দিয়ে সে বললো, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি!

গুটুলি বললো, তোমরা এখানে বেড়াতে এসেছো? কোথা থেকে এলে? কিসে করে এলে? তোমাদের সঙ্গে আর কে আছে?

হলদে ফ্রক-পরা মেয়েটি এবার অন্য মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ও আমার সঙ্গে আছে, আমি ওর সঙ্গে আছি। আর কেউ নেই।

তোমরা এই জঙ্গলের মধ্যে এলে কী করে! তোমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে?

লাল ফ্রক এবার হলদে ফ্রকের দিকে তাকিয়ে বললো, আমাদের গাড়ি কি খারাপ হয়ে গেছে? কি জানি। আমরা বেড়াতে এসেছি।

এই জঙ্গলে তোমরা দুটি মেয়ে বেড়াতে এসেছো, সঙ্গে কেউ নেই, এ তো বড় আশ্চর্য কথা।

হলদে ফ্রক বললো, বেড়াতে আসা বুঝি আশ্চর্য কথা? তোমরা এখানে কী করছো, তোমরা বেড়াতে আসো নি?

বণজয় যতদূর সম্ভব আশ্তে কিসফিস করে গুটুলিকে বললো, সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কী জানিস, এই মেয়ে দুটো আমার দেখে ভয় পেল না কেন? এই প্রথম দেখছি, কেউ আমার দেখে ভয়ে কাঁপছে না। মেয়ে দুটো তো মনে হচ্ছে, ক্লাস এইট-নাইনে পড়ে! আমাদের দেখে হাসতে শুরু করলো?

গুটুলি বললো, খুব পাকা মেয়ে। একা-একা বেড়াতে এসেছে!

তারপর সে গলা তুলে ওদের বললো, না, আমরা এখানে বেড়াতে আসিনি। আমরা এখানে থাকি!

হলদে ফ্রক ও লাল ফ্রক চোখাচোখি করলো একবার, তারপর লাল ফ্রক বললো, তোমরা জঙ্গলে থাকো? তোমরা কী জন্তু?

এইবারে রণজয় প্রচণ্ড জোরে শংকার দিয়ে বললো, আঁ, কী বললে ?
আমরা জন্তু ?

বয়ু ভাকাতের মতন লোকও প্রথমবার রণজয়ের এই রকম শংকার
শুনে ভয়ে একেবারে কঁকড়ে গিয়েছিল। মেয়ে দুটি আবার গিলগিল করে
হেসে উঠলো। তারপর তারা পুকুরের ধারে এসে বসে পড়লো হাঁটু গেড়ে।

গুটুলি বেগে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললো, এই খুকী, আমাদের
জন্তু বললে যে ? আবার হাসছো ?

দুটি মেয়েই প্রত্যেকবার কথা বলার আগে নিজেরা চোখাচোখি করে
কী যেন বলে নেয়। এবারে হলদে ফ্রক বললো, ভুল বলেছি বুঝি ? তোমরা
বললে কি না তোমরা জঙ্গলে থাকো, তাই আমরা ভাবলাম, জঙ্গলে তো
জন্তুরাই থাকে।

গুটুলি বললো, জঙ্গলে মানুষও থাকে। কিন্তু তোমাদের বায়েসী মেয়েরা
জঙ্গলে একা-একা আসে না। এখানে অনেক রকম বিপদ হতে পারে।

লাল ফ্রক বললো, আমরা একলা আসিনি তো, দু'জনে এসেছি। এখানে
কি রকম বিপদ হয় ?

গুটুলি বললো, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার থাকে, অনেক চোর-ডাকাতও
নুকিয়ে থাকে জঙ্গলে।

হলদে ফ্রক বললো, তোমরাই বুঝি চোর-ডাকাত ? তোমরা আমাদের
বিপদে ফেলবে ?

গুটুলি বললো, আচ্ছা মুশ্কিল তো, এই মেয়ে দুটো কিছু বোঝে না।
আমরা চোর-ডাকাত হলে কি তোমাদের আগে থেকে সাবধান করে দিতুম ?

রণজয় বললো, আহা রে, মেয়ে দুটি সত্যি বড় সরল। ওরা বেড়াতে
এসেছে, খুশী মতন বেড়িয়ে নিক। আমরা ওদের পাহারা দেবো।

মেয়ে দুটি আঁজলা করে পুকুর থেকে খানিকটা জল তুলে সেই জলের
দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর সেই জলে জিভ ঠেকালো।

গুটুলি চোঁচিয়ে বললো, ঐ পুকুরের জল খেও না। কাছেই একটা বনা
আছে, সেই বনার জল ভালো।

ওরা সেই কথায় তেমন আমল দিল না। চুমুক দিয়ে জলটুকু খেয়ে
নিয়ে একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে চোখে-চোখে কী যেন বললো।

পুকুরের ধারে ছোট-ছোট ঘাসফুল ফুটে আছে। ওদের একজন একটা
ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তাতেও জিভ ঠেকালো। অন্যজন আর-একটা ফুল তুলে
খেয়ে নিল টপ করে।

রণজয় বললো, আভারে, ওরা বোধহয় কান্টা জাঁদিয়ে বনের মধ্যে চলে এসেছে। খুব খিদে পেয়েছে ওদের। এই গুটিলি, ওদের ডাক না। ওরা আমাদের সঙ্গে জলখাবার খেতে পারে।

গুটিলি জিজ্ঞেস করলো, ওগো, ও মেয়ে। তোমাদের নাম কী?

লাল ফ্রকপরা মেয়েটি বললো, নাম? আমাদের নাম? হ্যাঁ, আমাদের একটা করে নাম আছে। আমার নাম কমুনা আর ওর নাম রুমুনা। এইবার বলো তো, তোমাদের নাম কী?

গুটিলি বললো, আমাকে সবাই গুটিলি বলে ডাকে। আর এই যে আমার বন্ধুকে দেখছো, এর নাম রণজয়, কিন্তু ওকে সবাই বলে নীল মানুষ।

রুমুনা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা একজন এত ছোট, আর একজন এত বড় কেন?

এই সময় দূর থেকে রঘু চৌচিয়ে বললো, চা, চা রেডি! বাবুদের কি পুকুর-পাড়ে চা দিতে হবে, না, এইখানে আসা হবে?

রণজয় বললো, রঘু, এইখানে চা আর খাবার-টাবার নিয়ে আয়!

গুটিলি বললো, ওগো কমুনা-রুমুনা, তোমরা আমাদের সঙ্গে চা খাবে এসো!

কমুনা-রুমুনা পরস্পরের চোখের দিকে তাকালো। তারপর কমুনা বললো, না, আমরা এখন ঐ দিকে বেড়াতে যাবো!

তারা দু'জনে নেমে পড়লো পুকুরে। তারপর পাশাপাশি দুটি হাঁসের মতন নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে কাটতে চলে গেল ওপারে। তারপর নেচে নেচে গা থেকে জল ঝরাতে লাগলো।

পুকুরের ঐধারে একটা বন-তুলসীর ঝোপ। মেয়ে দুটি সেখান থেকে টপাটপ ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলো।

রণজয় বললো, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওদের। ওরা কি মেয়ে, না প্রজাপতি?

গুটিলি চোখ গোল-গোল করে বললো, ওরা জুতো পরে জলে নেমে গেল, জুতো পরে সাঁতার কাটলো। এ কী গুণ্ডা মেয়ে রে বাবা! ওরা আবার ফুল খায়!

রণজয় বললো, অনেকে কুমড়া ফুল আর বকফুল ভাজা খায়। আমরা ঐ ফুল খেয়ে দেখিনি, হয়তো ভালোই লাগবে!

এই সময় রঘু একটা থালায় করে চায়ের কাপ আর রুটি নিয়ে এলো। থালাটা নামিয়ে রেখে সে গোমড়া মুখে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি পাখির ডিমের ওমলেট খাবে?

গুটুলি বললো, সে আবার কী? পাখির ডিমের ওমলেট মানে?

রঘু বললো, কালকের ঝড়ে অনেকগুলো গাছ ভেঙে পড়েছে তো। আমাদের গুহার সামনে ওরকম দুটো গাছে দেখলুম যে, বেশ কয়েকটা পাখির বাসা। তার থেকে আমি আট-দশটা ডিম কুড়িয়ে রেখেছি।

রণজয় বললো, ধুং! পাখির ডিম আবার কেউ খায় নাকি? ডিমগুলো যেখানে পেয়েছিস, সেখানে রেখে আয়। তবে একটা ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। অনেকদিন মুর্গীর ডিম খাওয়া হয়নি। এই জঙ্গলে আমি কয়েকবার বন-মুর্গীর ডাক শুনেছি। দেখতে হবে তো ওরা কোথায় ডিম পাড়ে।

গুটুলি বললো, মেয়ে দুটো গেল কোথায়?

মেয়ে দুটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। তারা ঢুকে পড়েছে পেছন দিকের জঙ্গলে।

গুটুলি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললো, এটা কিন্তু বেশ চিন্তার বিষয়। এখান থেকে গাড়ির রাস্তা অন্তত দশ-বারো মাইল দূরে। সেখান থেকে মেয়ে দুটো কি এত সকালে হেঁটে চলে এলো? কিংবা, কাল রাত্তিরে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ওরা এই জঙ্গলেই কাটিয়েছে? ওদের সঙ্গে কোনো পুরুষ মানুষ নেই কেন?

রঘু বললো, মেয়ে? কোথায় মেয়ে? তোমাদের ভয়ে এই জঙ্গলে ভূত-পেতলী ছাড়া আর কোনো মানুষ ঢুকবে না!

রণজয় বললো, রঘু, চাল আর ডাল আছে তো? দুপুরে ভালো করে খিচুড়ি বানা। বৃষ্টি পড়লেই আমার খিচুড়ির জন্য মন কেমন করে। গুটুলি আর আমি ততক্ষণ দেখে আসি, মেয়ে দুটো কী করছে!

রঘু বললো, সত্যি দুটো মেয়ে এসেছে নাকি? আমি তাদের দেখতে যাবো না? রান্না না হয় পরে হবে!

রণজয় আঙুল তুলে ধমক দিয়ে বললো, যা, নিজের কাজ কর গিয়ে!

গুটুলি বললো, রঘু, আবার যদি পালানোর চেষ্টা করিস, তা হলে এবার কিন্তু তোর গ্যাং খোঁড়া করে দেব!

রণজয় গুটুলিকে তুলে নিল কাঁধের ওপর। তারপর লম্বা-লম্বা পা ফেলে পুকুরের ধার ঘুরে পেছন দিকের জঙ্গলটায় ঢুকে পড়লো।

একটু খুঁজতেই দেখতে পাওয়া গেল মেয়ে দুটিকে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একটা ফাঁকা জায়গায় মুখোমুখি বসে আছে রুমুনা আর ঝুমুনা, তাদের

মাঝখানে দুটো ছাই রঙের খরগোশ। মেয়ে দুটি হাততালি দিচ্ছে আর খরগোশ দুটো নাচছে।

গুটুলি বললো, বুনো খরগোশ ওদের কাছে পোষ মেনেছে, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার?

রুমুনা গুন গুন করে একটা গান শুরু করলো, ঝুমুনা তার ঝোলা থেকে একটা ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগলো।

গুটুলিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে রণজয় বললো, তুই ঐ দিকটায় দাঁড়া। খরগোশ দুটো ধরতে হবে। খিচুড়ির সঙ্গে খরগোশের রোস্ট খুব ভালো জমবে।

রণজয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে গান থামিয়ে রুমুনা বললো, নীল মানুষ, এই জিনিস দুটোর নাম কি?

রণজয় বললো, জিনিস মানে? এ দুটো তো খরগোশ। তোমরা খরগোশ চেনো না? তোমরা কোন্ দেশের মেয়ে!

গুটুলি বললো, এরা আসলে মেয়ে কিনা, আমার সন্দেহ হচ্ছে।

রণজয় বললো, ওগো রুমুনা, ঝুমুনা, আজ দুপুরে আমাদের গুহায় তোমাদের নেমন্তন্ন। খিচুড়ি আর খরগোশের রোস্ট।

খরগোশ দুটো নাচ থামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পালাচ্ছে না। রণজয় হাত বাড়িয়ে খরগোশ দুটোকে ধরতে যেতেই রুমুনা বললো, এই, ওদের ধরবে না!

রণজয়ের হাত দুটো সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে গেল। তার থেকেও শক্তিশালী যেন কেউ চেপে ধরলো তার হাত। সে প্রচণ্ড চেষ্টা করেও তার হাত দুটো নামাতে পারলো না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রণজয় বললো, এইবার বুঝছি। প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল....তোমরা দু'জন অন্য গ্রহ থেকে এসেছো, তাই না?

ঝুমুনা খরগোশ দুটোর গায়ে হাত বুলিয়ে বললো, এই, যাঃ যাঃ। তোরা খেলতে যা!

খরগোশ দুটো এবার তিন লাফে পালিয়ে গেল পাশের ঝোপে।

রুমুনা বললো, আমরা তো অন্য গ্রহ থেকে আসিনি। আমরা অনেক দূরে থাকি, রাত্তিরবেলা তোমরা যে ছায়াপথ দেখতে পাও, সেইখানে। ছুটির সময় আমরা বেড়াতে যাই। আমরা দু'জনেই তো ফুল নিয়ে পড়াশুনো করি, তাই তোমাদের এখানে ফুল চেখে দেখতে এসেছি। তোমাদের এই ছোট জায়গায় অনেক রকম ফুল ফোটে।

ঝুমুনা বললো, আমরা নিজের মনে বেড়াবো, তোমরা তোমাদের কাজ করতে যাও না!

রণজয় বললো, কাল রাত্তিরে একটা মহাকাশযান তোমাদের এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে, ঠিক কিনা? সেই জন্যই হঠাৎ ওরকম ঝড়-বৃষ্টি আর ভূমিকম্প হলো। বেশ বড় স্পেসশিপ মনে হচ্ছে। তোমরা সঙ্গে অদৃশ্য বডিগার্ড নিয়ে এসেছো বুঝি?

ঝুমুনা বলো, বডিগার্ড আবার কী? কেন, আমরা নিজেরা বুঝি বেড়াতে পারি না?

রণজয় বললো, আমার হাত দুটো কে চেপে ধরে আছে? ছেড়ে দিতে বলো!

মেয়ে দুটি একথা শুনে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। খুব মিষ্টি তাদের হাসির শব্দ। ঝনার কুলকুল শব্দের মতন।

ঝুমুনা বললো, তোমার হাত আবার কে ধরে থাকবে? আমরা তো কারকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি হাত দুটো ওরকম উঁচু করে আছো কেন, নিচে নামাও!

রণজয়ের হাত দুটো আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে তাকালো গুটুলির দিকে। গুটুলির মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গেছে। সে ফিসফিস করে বললো, ওস্তাদ, এই মেয়ে দুটোর চোখ একেবারে সবুজ। ভেতরে যেন আলো জ্বলছে। এরা কি সত্যিকারের মেয়ে?

রণজয় বললো, সেটাও একটা কথা বটে। ওগো ঝুমুনা-ঝুমুনা, তোমরা কি সত্যিকারের মেয়ে? নাকি তোমাদের চেহারা অন্যরকম, ইচ্ছে করে পৃথিবীর মেয়েদের রূপ ধরেছে?

ঝুমুনা বললো, আমরা আমাদের মতন, আমরা হঠাৎ পৃথিবীর মেয়ে সাজতে যাবো কেন? তোমরা বাপু এখন যাও, আমাদের অনেক কাজ আছে। তোমাদের পৃথিবীর সব রকম ফুল আমাদের একটু-একটু খেয়ে দেখতে হবে। ঐ যে ঐ বড় গাছটায় ফুল ফুটে আছে, ওগুলো কী ফুল?

রণজয় বললো, ও তো শালগাছের ফুল। অত উঁচু থেকে তোমরা পাড়বে কী করে? দাঁড়াও, আমি পেড়ে দিচ্ছি।

রণজয় উঠে দাঁড়াবার আগেই ঝুমুনা তরতর করে সেই গাছে উঠে গেল। ঠিক গাছ বেয়ে ওঠা নয়, জুতো-পরা অবস্থাতেই সে যেন হেঁটে উঠে গেল গাছটার ডগায়। খানিকটা ফুল পেড়ে এনে নিজে একটু খেয়ে দেখলো, বাকিটা দিল ঝুমুনাকে।

রণজয় বললো, হুঁ, বুঝলুম, মাধ্যাকর্ষণে তোমাদের আটকাতে পারে না। তা শোনো রুমুনা আর ঝুমুনা, এই পৃথিবীর মানুষ তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু আমি মহাশূন্যের অন্য অনেক গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে এসেছি। আমি নীল মানুষের গ্রহে গেছি, অদৃশ্য মানুষদের গ্রহে দেখেছি, তারপর যেখানে মানুষখেকো রাক্ষুসে গাছ আছে...তোমরা ঠিক কী উদ্দেশ্যে এসেছো বলো তো? শুধু ফুল খেতে? আমাদের পৃথিবীর কোনো ক্ষতি করতে আসোনি তো?

রুমুনা বললো, কী বিচ্ছিরি কথা! আমরা তোমাদের ক্ষতি করবো কেন? আমরা বেড়াতে এসেছি, আজ রাত্তিরেই আবার ফিরে যাবো।

বাঃ, তা হলে তো তোমরা আমাদের অতিথি। আজ দুপুরে খিচুড়ি খেতে চলো আমাদের সঙ্গে। আচ্ছা, আমি যে খরীগোশ দুটো ধরার চেষ্টা করলুম, তোমরা বাধা দিলে কেন?

বলেছি তো, তোমরা আমাদের বিরক্ত করো না। আমাদের ইচ্ছে মতন বেড়াতে দাও। তোমরা অন্য জায়গায় যাও।

আমাকে এরকম বকে বকে কথা বলছো? জানো, তোমাদের বয়েসী ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখেই কত ভয় পায়!

যাবা ভয় পায়, তুমি তাদের ভয় দেখাওগে! আমরা ভয় পেতে একদম ভালোবাসি না।

গুটুলি বললো, ওস্তাদ, চলো, কেটে পড়ি! ওদের চোখের দিকে তাকালেই আমার বুক কাঁপে!

রণজয় বললো, সে কিরে, দুটো পুঁচকে মেয়েকে দেখে আমরা ভয় পেয়ে পালাবো? তা হলে দ্যাখ—

রণজয় দু'হাতে রুমুনা আর ঝুমুনাকে তুলে নিয়েই ছুঁড়ে দিল শূন্যে, তারপর তাদের হাত-বদল করে আবার লুফে নিয়ে বললো, এবার? কেমন লাগলো?

রুমুনা বললো, আমাদের মাটিতে নামিয়ে দাও!

ঝুমুনা মুচকি হেসে বললো, এটা আবার একটা খেলা নাকি? তোমরা অন্য একটা খেলা দেখবে?

মাটিতে দাঁড়িয়ে ঝুমুনা এক আঙুলের ছোঁয়া দিয়ে গুটুলি আর রণজয়কে শুধু ঘুরিয়ে দিল একবার। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দু'জন দুটো দু'সাইজের লাটুর মতন রন্বন্ব করে ঘুরতে লাগলো।

রণজয় চোঁচিয়ে বললো, থামাও, থামাও, আমাদের থামিয়ে দাও!

রুমুনা আর ঝুমুনা হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলো মাটিতে।

দূরে হঠাৎ অনেক লোকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কারা যেন এইদিকেই আসছে।

রুমুনা-ঝুমুনা এবার হাসি থামিয়ে উঠে বসলো। ওদের মধ্যে একজন থামিয়ে দিল রণজয় আর গুটুলিকে।

রণজয় বললো, এবারে তোমাদের আর একটা খেলা দেখাই?

হুড়মুড় করে গাছপালা ভেদ করে বেরিয়ে এলো কয়েকজন পুলিশ। সবার হাতে বন্দুক। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে রঘু।

রঘু হাত তুলে বললো, ঐ দেখুন স্যার, ঐ সেই দৈত্যটা। খুব সাবধান, ওকে পালাতে দেবেন না। এই দৈত্যটাই এদিককার সব ডাকাতি করে। আর ঐ যে বেঁটে বাঁটকুলটা, ঐটা মহাশয়তান। এদের চিড়িয়াখানায় বন্ধ করে রাখুন, স্যার।

রণজয়ের বিশাল চেহারা দেখে পুলিশদের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। শুধু ওদের মধ্যে যে ইন্সপেকটর, সে রিভলভার উঁচিয়ে বললো, হ্যান্ডস্ আপ! দৈত্য কোথায়, এ তো একটা লম্বা লোক। গায়ে নীল রং মেখেছে। গীনেস বুক অফ রেকর্ডসে এর চেয়েও লম্বা লোক আছে।

রঘু বললো, না স্যার, ও সত্যি দৈত্য। ওর গায়ে গুলি লাগলেও বোধহয় মরবে না। ঐ বেঁটে গুটুলিটাকে আগে ধরুন!

ইন্সপেকটর বললো, এই মেয়ে দুটি কোথা থেকে এলো?

রঘু বললো, দৈত্যটাই নিশ্চয়ই ওদের ধরে এনেছে, স্যার।

ইন্সপেকটর রুমুনা আর ঝুমুনাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কে, মা? তোমরা কোথা থেকে এসেছো?

রুমুনা মিষ্টি হেসে বললো, আমরা বেড়াতে এসেছি। তোমরা কে? তোমরা বুঝি চোর-ডাকাত?

ইন্সপেকটর শব্দ করে হেসে উঠলো। তারপর রণজয়কে বললো, চল, চল ব্যাটা?

একজন পুলিশ গুটুলির ঠিক মাথার কাছে বন্দুক তাক করে আছে। রণজয় বুঝতে পারলো, সে একটু এগোবার চেষ্টা করলেই ওরা আগে গুটুলিকে গুলি করবে। বিশ্বাসঘাতক রঘু ওদের আগেই বলে দিয়েছে যে, সে গুটুলিকে কতটা ভালোবাসে।

সে রুমুনা আর ঝুমুনার দিকে তাকিয়ে বললো, ওরা আমাদের ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। তা হলে যাই? আর দেখা হলো না!

ইন্সপেকটর বললো, এই মেয়ে দুটিকেও যেতে হবে থানায়। চলো তো মা, চলো, কোনো ভয় নেই। আমাদের সঙ্গে চলো।

রুমুনা বললো, না, আমরা যাবো না। আমরা বেড়াতে এসেছি!

রণজয় বললো, তোমাদের যদি ওরা জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায়, আমি তোমাদের বাঁচাবো। দেখবে?

যে রুমুনা আর ঝুমুনাকে দু'হাত তুলে নিয়ে খুব উঁচুতে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, বাও! তোমরা তোমাদের দেশে চলে যাও।

রুমুনা আর ঝুমুনা ঠিক দুটো পাখির মতন উড়তে লাগল। বনের মাথায়। পুলিশরা হাঁ করে ওপরের দিকে চেয়ে রইলো। সেই সুযোগে রণজয় একজন পুলিশের বন্দুকটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই ইন্সপেকটরটি চালিয়ে দিল তার বুকে একটা গুলি! রণজয় বসে পড়লো মাটিতে।

রুমুনা আর ঝুমুনা ওপরে উড়তে উড়তে একজন আর-একজনকে বললো, ঐ লম্বা লোকটা মোটে একটাই খেলা জানে। আয়, ওদের আমি অন্য একটা খেলা দেখাই।

ঝুমুনা বললো, পরে যে লোকগুলো এলো, ওদের ঘুমিয়ে ফেললে কেমন হয়?

রুমুনা বললো, ওরা আমাদের জোর করে নিয়ে যেতে চাইছিল, ওরা লোক ভালো না। ওরাই বোধহয় চোর-ডাকাত। ওদের ঘুম পাড়িয়ে দি?

ঝুমুনা আর রুমুনা উড়তে উড়তে একটা সুন্দর গান ধরলো। ঠিক যেন বাঁশির মতন আওয়াজ বেরুলো তাদের গলা দিয়ে। সেই গান শুনে এক-একজন পুলিশ ধূপধাপ করে পড়ে যেতে লাগলো মাটিতে। সবাই অজ্ঞান। এমনকি, গাছের পাখিরাও ঘুমিয়ে পড়লো।

রুমুনা আর ঝুমুনা নিচে নেমে এসে রণজয় আর গুটুলির হাত ধরে আবার উড়ান দিল। বনের মাথা ছাড়িয়ে, অনেক অনেক ওপরে, প্রায় মেঘের কাছে চলে এলো ওরা। রণজয়ের বুকে গুলি লেগেছে, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে, কিন্তু তার প্রাণ আছে। রুমুনা আঙুলে করে তার মুখের একটু থুতু রণজয়ের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতেই তার রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

চোখে ছুঁ দিয়ে ওদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো ঝুমুনা। তারপর বললো, এবারে মেঘের পিঠে বসিয়ে দেবো তোমাদের। ভাসতে ভাসতে চলে যাবে সমুদ্রে। এই খেলাটা তোমরা জানো?

রণজয় বললো, না, জানি না। লক্ষ্মী দুই মেয়ে, তোমাদের কাছে আমি হেরে গেছি। হেরে গিয়েও আনন্দ হচ্ছে।

বগজয়ের শহর-অভিযান

www.banglabookpdf.blogspot.com



রণজয়ের শহর-অভিযান

ঘুম থেকে উঠে একটা মস্ত হাই তুলে রণজয় বললো, ধুং, আর এই জঙ্গলে থাকতে ভালো লাগে না! দিনের পর দিন একই রকম সবকিছু একঘেয়ে হয়ে গেছে।

গুটুলি একটু দূরে বসে একটা ছুরি নিয়ে পেয়ারা গাছের ডাল কেটে কেটে একটা গুলতি বানাচ্ছিল। সে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, জঙ্গল ছেড়ে কোথায় যাবে?

রণজয় বললো, শহরে গিয়ে সিনেমা দেখবো, ফুটবল ম্যাচ দেখবো। দোকানের চা আর সিগাড়া খাবো! ওঃ, কতদিন যে গরম গরম সিগাড়া খাইনি।

গুটুলি বললো, তুমি তো শহরে যেতে পারবে না। আমি বরং গিয়ে তোমার জন্য সিগাড়া এনে দিতে পারি। আর আমি সিনেমা দেখে এসে তোমাকে সেই গল্পটা শোনাতে পারি।

রণজয় চোখ বড় বড় করে বললো, তুই সিনেমা দেখবি আর আমি সেই গল্প শুনবো? মারবো এক গাঁটা! কেন, আমি শহরে যেতে পারবো না কেন রে?

গুটুলি বললো, তুমি আট ফুট লম্বা মানুষ, আর তোমার গায়ের রং ফাউন্টেন পেনের কালির মতন নীল। তোমাকে দেখলেই যে সবাই দৈত্য ভাববে!

রণজয় বললো, দৈত্য আবার কী? আজকালকার দিনে দৈত্য বলে কিছু আছে নাকি? মানুষ হঠাৎ বেশি লম্বা হয়ে যেতে পারে না? শহরে কি এমন কিছু নিয়ম করা আছে যে, এর বেশি লম্বা লোক সেখানে যেতে পারবে না?

গুটুলি বললো, তুমি শুধু-শুধু আমাকে ধমকাচ্ছে কেন, ওস্তাদ? আমি কি কোনো শহরের মালিক? এর আগে তুমি আর আমি শহরে যাবার চেষ্টা করেছি, দু' একবার লোকে ভয় পেয়ে পালিয়েছে, মনে নেই? শহরের

লোকরা শুধু মাঝারি মাপের মানুষ পছন্দ করে। তুমি বেশি লম্বা বলে তোমাকে দেখে ভয় পায়, আর আমি খুব বেঁটে বলে আমার মাথায় সবাই চাঁচি মারে।

রণজয় উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চল এবার আমরা একটা বেশ বড় শহরে যাবো। লোকে ভয় পেলে আমি তার কী করতে পারি। আমি তো ইচ্ছে করে কারকে ভয় দেখাচ্ছি না, কারুর কোনো ক্ষতিও করছি না।

গুটুলি তবু বললো, কী দরকার ঝামেলার মধ্যে গিয়ে! এই জঙ্গলে তো আমরা বেশ আছি।

রণজয় দু' হাত দিয়ে গুটুলিকে শূন্য তুলে প্রচণ্ড চিৎকার করে বললো, আমার ভালো লাগছে না। আমার ভালো লাগছে না! আমার কিছু ভালো লাগছে না!

সেই আওয়াজ গুটুলির কান ফেটে যাবার যোগাড়। সে দুহাতে কান চেপে ধরলো।

সন্ধে হয়ে এসেছে, একটু পরেই ঘুপ করে অন্ধকার নেমে আসবে। এর পর সারা রাত ধরে এখানে করার কিছুই থাকে না। রণজয় দিনের বেলা লম্বা ঘুম দিয়েছে, রাত্তিরে তার ঘুমও আসবে না।

রঘু নামে যে ডাকাতটা ওদের রান্নাবান্না করে দিত, সে দিন সাতেক আগে পালিয়েছে। রঘুর যে গ্রামে বাড়ি, সেই গ্রামটা চেনে গুটুলি। ইচ্ছে করলেই তাকে আবার ধরে আনা যায়। কিন্তু রণজয় আর উৎসাহ বোধ করেনি। ধরে আনলেও সে আবার পালাবার চেষ্টা করবেই। ডাকাত কখনো রান্নাবান্নার কাজে সন্তুষ্ট থাকতে পারে?

গুটুলিকে কাঁধের ওপর বসিয়ে রণজয় লম্বা-লম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করলো। শুকনো পাতার ওপর মচর মচর শব্দ হতে লাগলো। রণজয়ের পায়ের আওয়াজ পেলে হিংস্র প্রাণীরাও ভয়ে দূরে সরে যায়। একদিন একটা চিতাবাঘ রণজয়ের সামনে এসে পড়েছিল, তার পরেই সে কী জোর দৌড় লাগালো লাজ গুটিয়ে! যেন একটা ভীতু নেড়ি কুকুর!

এই জঙ্গলের প্রায় মাঝখান দিয়েই একটা হাইওয়ে চলে গেছে। সেটা রণজয় চেনে। রাত্তিরের দিকেও সেই রাস্তা দিয়ে অনেক ট্রাক যায় নানারকম মালপত্র নিয়ে। একবার রণজয় সেই রকম একটা চলন্ত ট্রাক থেকে একটা বস্তা তুলে নিয়েছিল। সেই বস্তাটায় ভর্তি ছিল আলু। রণজয় অনেকদিন আলুসেদ্ধ খায়নি। সেই বস্তাটা পেয়ে তার দারুণ আনন্দ হয়েছিল। পরপর তিনচার দিন আলুসেদ্ধ খাওয়া হলো। তারপর আর একদিন রণজয় আর একটা বস্তা তুলে নিল, সেটাতে কিন্তু ছিল লোহালব্ধ! আর একটা বস্তায়

পেল সিমেণ্ট! আলুর বস্তা আর পায়নি।

সেই রাস্তাটার কাছাকাছি এসে গুটুলি বললো, ওস্তাদ, শহর কত দূরে, তার তো কোনো ঠিক নেই। সারারাত ধরে হাঁটবে নাকি? পায়ে ব্যথা হয়ে যাবে না?

রণজয় বললো, হেঁটে না গেলে কে আমাদের গাড়ি করে নিয়ে যাবে?

গুটুলি বললো, কোনো লরির ড্রাইভারকে অনুরোধ করলেই তো হয়। সব লরিই নিশ্চয়ই শহরে যায়।

রণজয় বললো, আমরা অনুরোধ করলেই শুনবে?

গুটুলি বললো, তুমি একটা লরি থামাও। আমি কথা বলবো।

বড় রাস্তাটার পাশে একটা পাথরের আড়ালে ওরা দাঁড়িয়ে রইলো একটুক্ষণ। পরপর দুটো মারুতি আর ফিয়াট গাড়ি গেল, কিন্তু কোনো লরির দেখা নেই। যেদিন যেটা দরকার, সেটা কিছুতেই পাওয়া যাবে না। ছোট গাড়িতে বসতেই পারবে না রণজয়, তার বাস কিংবা লরি দরকার।

দুঘন্টা দাঁড়বার পর রণজয় যখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে, তখন দূরে দেখা গেল এক জোড়া জোরালো হেডলাইট। হ্যাঁ, এবার একটা ট্রাক আসছে বটে।

ট্রাকটা ঘাঁকানো, পেছনে কোনো মালপত্র নেই, তাই আসছে খুব স্পীডে। রণজয় রেডি হয়ে রইলো। কাছে আসতেই সে লম্বা হাত বাড়িয়ে পেছনটা চেপে ধরলো।

কিন্তু সে ধরে রাখতে পারলো না। হঠাৎ বাধা পেয়ে ট্রাকটা থরথর করে কাঁপতে লাগলো, ইঞ্জিনে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হতে লাগলো, আবার হুস করে বেরিয়ে গেল।

রণজয় আফশোসের সঙ্গে বললো, যাঃ!

ট্রাকের ড্রাইভারটি কিছু বুঝতে পারেনি। হঠাৎ ট্রাকটার এই রকম ব্যবহারে চিন্তিত হয়ে সে একটু দূরে গিয়ে ব্রেক কষলো। তারপর নেমে দেখতে এলো চাকাগুলো।

ড্রাইভারটা টর্চ ছেলে নিচু হয়ে চাকা দেখছে, অল্পবয়েসী ক্লিনার ছেলেটিও তার সঙ্গে নেমেছে। রণজয় কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই, এত দেরি করলি কেন রে? এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

ক্লিনার ছেলেটি মুখ তুলে রণজয়ের সেই বিশাল মূর্তি দেখেই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ভু-ভু-ভু—বলতে বলতে মারলো টেনে দৌড়। মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

ড্রাইভারটি সদরজী, সে এত সহজে ভয় পেল না, সে একসাথে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে কোমর থেকে টেনে বার করলো কৃপাণ।

রণজয় বললো, আরে, এ যে দেখছি, ঐ পুঁচকে একটা ছুরি নিয়ে আমার সঙ্গে লড়াই করতে চায়।

এবার গুটুলি রণজয়ের আড়াল থেকে সামনে এসে বললো, সদরজী, বাঁচে গা না মরে গা?

এবার সেই সদরজীর চোখ দুটো প্রায় বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো। একবার সে প্রকাণ্ড চেহারার রণজয়কে দেখলো, আবার দেখলো একরঙি চেহারার গুটুলিকে।

গুটুলি বললো, ও সদরজী, তুমি লড়াই করলে মর জায়েগা। আর লড়াই না করলে বাঁচে গা!

সদরজী তবু কৃপাণটা উঁচিয়ে ধরে রইলো।

গুটুলি বললো, ছুরি খাপ মে রাখ দেও। হামলোগা ভূত না— মানুষ। তুমি আমাদের শহরে পৌঁছে দেবে?

সদরজী এবার কাঁপা-কাঁপা গলায় বললো, মানুষ?

রণজয় বললো, হ্যাঁরে বাবা, মানুষ! একটু বেশি লম্বা হয়ে গেছি, তাতে কী হয়েছে? আমাদের কথা শুনে চলো, তা হলে তোমার কোনো ভয় নেই।

গুটুলি বললো, তোমার শাকরদটি কোথায় ভরে পালালো? ডাকো তাকে।

রণজয় ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে পড়ে বললো, ওঃ, কতদিন পরে গাড়িতে চাপছি। আমিও যে একসময় একটা ভদরলোকের বাড়ির ছেলে ছিলাম, তা ভুলেই যাচ্ছিলাম প্রায়। একেবারে জংলী হয়ে গেছি।

গুটুলি আর সদরজী মিলে খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করলো ক্লিনারটিকে। কিন্তু তার আর পান্ডাই পাওয়া গেল না।

এবার সদরজী উঠে বসে রণজয়কে আবার ভালো করে দেখলো। হাত বাড়িয়ে রণজয়ের গায়ে আঙুল ঘষলো একবার। রং করা হয়নি, রণজয়ের গায়ের চামড়া সত্যিই ঘন নীল। মুখখানা নীল।

ড্রাইভারটি জিজ্ঞেস করলো, এইসা কায়সে হয়্যা?

রণজয় বললো, সে অনেক লম্বা গল্প। তোমাকে চট করে বোঝানো যাবে না।

ড্রাইভারটি বললো, কুছ দাওয়াই খাকে হয়্যা? হামকো দেও। আমার

শরীরটাও তোমার মতন করে দাও।

রণজয় হেসে বললো, ওরে গুটুলি, ওষে আমার মতন হতে চায়!

গুটুলি ড্রাইভারটির দাড়িওয়ালা খুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে বললো, অত সোজা নয়, চাঁদু। এবার গাড়ি স্টার্ট দাও তো!

গাড়িটা চলতে শুরু করার পর রণজয় বললো, ওরে গুটুলি, এরকম একটা নেংটি পরে শহরে যাবো কী করে? শহরে সেজে গুজে যাওয়া উচিত, তাই না? আগে একটা পোশাকের দোকানে যেতে হবে!

গুটুলি বললো, তোমার মাপের কোনো জামা-প্যান্ট কি কোনো দোকানে পাওয়া যাবে? দর্জি দিয়ে বানাতে হবে! আমার কোনো অসুবিধে নেই। যে-কোনো দোকানেই বাচ্চাদের পোশাক পাওয়া যায়। সাত-আট বছরের ছেলেদের জামা আমার গায়ে লেগে যায়।

রণজয় বললো, আমি দর্জি দিয়ে জামা-প্যান্ট বানাবো। স্পেশাল অর্ডার দিয়ে জুতো বানাবো। আমি মোটেই আর জংলী সেজে থাকতে পারবো না।

গুটুলি মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো, পয়সা কোথায় পাবে?

রণজয় বললো, ইচ্ছে করলেই তো আমি যে-কোনো ব্যাঙ্ক লুট করতে পারি।

সদারজী চমকে উঠে বললো, ব্যাঙ্ক লুট? হাঁ-হাঁ, ইয়ে তো আচ্ছা बात হয়। আগে একটা ব্যাঙ্ক নিয়ে যাবো তোমাদের?

রণজয় বললো, না! ইচ্ছে করলে ব্যাঙ্ক লুট করতে পারি বলেছি, কিন্তু করবো না। আমি টাকা রোজগার করবো! শহরে কত রকম কাজ থাকে।

সদারজী বললো, হাঁ হাঁ, আমি আপনাদের কাজ দেবো।

ট্রাকটা ছুটে চলেছে অন্ধকার ভেদ করে। জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে ক্রমশ। আকাশে আজ চাঁদ নেই।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর রণজয় বললো, জানিস গুটুলি, আমি মহাশূন্যে অনেকগুলো গ্রহ ঘুরেছি। কত রকম রকেট চালিয়েছি। অথচ আমি গাড়ি চালানো শিখিনি। আমি ইন্টার-গ্যালাকটিক মিসাইল চালাতে পেরেছি, আর এই রকম একটা ট্রাক চালাতে পারবো না?

গুটুলি বললো, চেষ্টা করে দেখো না। পারতেও পারো।

—ঠিক বলেছিস তে। কখনো চেষ্টা করে দেখিনি। একবার চেষ্টা করতে দোষ কী?

সদরজীকে সরে বসতে বলো।

—সদরজী ব্রেক কষো। আমি একবার চালিয়ে দেখবো।

সদরজী প্রথমে কিছুতেই রাজী হতে চায় না। তখন রণজয় জোর করে সদরজীর পা দুটো তুলে দিল ওপরে। নিজেই ব্রেকে একটা লাথি কষালো। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ট্রাক।

সদরজীকে পাঁজাকোলা করে তুলে পাশে সরিয়ে দিয়ে রণজয় নিজে বসলো সিট্যারিং-এ।

তারপর বললো, দেখে নিয়েছি এটা সুইচ, এটা গিয়ার আর এটা অ্যাকসিলারেটর। আর ব্রেক তো সবাই চেনে। যে পাইলট প্লেন চালায় সে কি গাড়ি চালাতে পারবে না? জয় মা কালী! দেখা যাক, কী হয়।

সুইচ দিয়ে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিতেই ট্রাকটা হঠাৎ বিরাট জোরে ছুটতে শুরু করলো।

সদরজী আতঁ স্বরে চৈঁচিয়ে উঠলো, রোকো! রোকো! রোকো! মর যাবগা!

রণজয় অ্যাকসিলারেটরের উপর পা আলগা করে বললো, প্রথমেই বেশি স্পীড হয়ে গেছে, এই তো? কমিয়ে দিচ্ছি! সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, বাস! এবার ট্রাক আছে? সত্যিই, এবার ট্রাকটা বেশ স্বাভাবিকভাবে চলছে।

গুটুলি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো।

রণজয় বললো, গাড়ি চালানো তাহলে এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। বাস, এবারে শহরে গিয়ে জামা-কাপড় তৈরি করাবো, কাজ করে টাকা রোজগার করবো, সিনেমা দেখবো, সিঙাড়া-কচুরি খাবো, গাড়ি নিয়ে বেড়াবো—

এর পর রণজয়ই ট্রাকটা চালাতে লাগলো, সদরজী তাকে বলতে লাগলো ডান দিকে না বাঁ দিকে যেতে হবে।

প্রায় রাত একটার সময় দেখা যেতে লাগলো পাকা বাড়িঘর। অনেকটা শহরের মতন।

সদরজী বললো, এখানে থামবে। এখানে আমার ট্রাকে ডিজেল ভরে নিতে হবে। আমার চেনা একজনের পেট্রল পাম্প আছে। সেখানে ভালো খানাপিনা হবে।

রণজয় বললো, তা থামা যেতে পারে।

গুটুলি বললো, খিদেও পেয়েছে বেশ!

পেট্রল পাম্পের পাশে ট্রাকটা থামাবার পর সদরজী বললো, আপলোগ

আগে বসুন। আমি পাম্পের মালিকের সাথে বাতর্জিত করে আসি। প্রথমেই আপনাকে দেখলে ভয় পেয়ে যাবে।

রণজয় বললো, সেটা ভালো কথা!

সদরজী নেমে ভেতরে চলে গেল।

পেট্রল পাম্পের পেছনের দিকে একটা লম্বা গুদামের মতন বাড়ি। কাছাকাছি আরও কয়েকটা দোকান রয়েছে, কিন্তু সেগুলো এখন বন্ধ। চতুর্দিক নিরুন্ম।

একটু পরেই সদরজী সঙ্গে দু' তিনজন লোক এগিয়ে এলো এদিকে। তাদের মধ্যে একজনের পেটমোটা পিপের মতন চেহারা। সে ব্যস্ত হয়ে বললো, কোথায়? কোথায় রে দৈত্য?

সদরজী ট্রাকের দরজা খুলে বললো, নেমে আসুন, বাবুজী!

রণজয় নেমে দাঁড়াতেই সবাই ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেল। অন্যদের একজনের হাতে একটা রাইফেল, অন্য একজনের হাতে একটা শাবল।

রণজয় বললো, নমস্কার!

গুটলিও তার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, নমস্কার।

পেটমোটা লোকটি বললো, ওরে বাবা! সত্যিই যে দেখছি দৈত্য! আট

ফুট কী বললে সদরজী, তার চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে!

রণজয় যতদূর সম্ভব গলার আওয়াজ নরম করে বললো, আজ্ঞে, আমার হাইট আট ফুট পাঁচ ইঞ্চি। কিন্তু আমি দৈত্য নই। একটা বিশেষ কারণে আমার চেহারাটা বদলে গেছে! আমি লেখাপড়া জানি, ভদ্রব্যবহারের সম্ভান।

পেটমোটা লোকটি বললো, ঠিক মানুষের মতনই তো কথা বলে।

রণজয় আবার বললো, আমরা সত্যিই মানুষ! আমরা আপনাদের কোনো ক্ষতি করবো না। এই আমার বন্ধু গুটলি, তার চেহারা ছোট হলেও বুদ্ধি ছোট নয়।

সদরজী বললো, ভিতরে আসুন, ভিতরে আসুন। খানা তৈরি। এই শেঠজী আপনাদের দেখে খুব খুশি হয়েছেন।

পেটমোটা শেঠজী বললো, হাঁ হাঁ, আসুন! খানা খেয়ে লিন।

এর পর রণজয় আর গুটলির জন্য খাতির-যত্নের ধুম পড়ে গেল। লম্বা গোড়াউনের মতন বাড়িটা একটা সিনেমা হল। সেটারও মালিক ঐ শেঠজী। তাঁর আরও অনেক ব্যবসা আছে। একটা সার্কাস কোম্পানিও আছে তাঁর।

গরম গরম রুটি আর আলুর তরকারি খেতে দেওয়া হলো ওদের।

গুটুলি খেল তিনখানা রুটি, রণজয় পঁয়ষট্টিটা রুটি শেষ করার পর বললো, আর পারছি না। পেট ভরে গেছে।

খেতে খেতে রণজয় ওদের কাছে নিজের গল্প শোনালো। কী করে অন্য গ্রহের প্রাণীরা ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কী করে শরীরটা এভাবে বদলে গেল।

রণজয় শহরে এসে থাকতে চায় শুনে শেঠজী বললো, আপনারা দু'জনে আমার এখানেই থাকুন। আমি চাকরি দেবো। প্রত্যেকদিন পেট ভরে খাবার পাবেন।

রণজয় খুব খুশি হয়ে বললো, বাঃ, তবে তো খুব ভালো। আপনি যা কাজ বলবেন, সব করে দেবো। আর রোজ রোজ সিনেমা দেখবো। এখানে সিনেমা ক'টার সময় শুরু হয়?

শেঠজী বললো, সিনেমা দেখবেন? এখুনি চালিয়ে দিচ্ছি। শুধু আপনাদের দু'জনের জন্য। যত ইচ্ছে সিনেমা দেখুন না!

সত্যি সত্যি সেই রাত্তিরেই সিনেমা চালু হয়ে গেল। দর্শক মাত্র দু'জন। হল্ অন্ধকার, পর্দায় ফুটে উঠলো একটা বিদেশী ছবি। বিকট গোরিলার মতন একটা প্রাণী জাপানের একটা শহর আক্রমণ করেছে। প্রথম থেকেই মারামারি।

রণজয় তবু লেখাপড়া শিখেছে। সে এইসব বিদেশী সিনেমাও একসময় দেখেছে কিছু কিছু। গুটুলি গ্রামের যাত্রা ছাড়া আর কিছুই দেখেনি কখনো। সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতাই তার এই প্রথম।

সে প্রথম প্রথম দারুণ উৎসাহ নিয়ে দেখতে লাগলো। সিনেমার পর্দায় যখন আকাশের একটা প্লেন ভেঙে পড়ছে, সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ভয়ের চোটে।

কিন্তু বেশিক্ষণ তার উৎসাহ রইলো না। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়লো। রণজয় দু'তিন বার ঠেলা দিয়ে তাকে জাগাবার চেষ্টা করেও কোনো লাভ হলো না। কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারছে না গুটুলি।

রণজয় একাই দেখতে লাগলো সিনেমা। অনেকদিন পর সে সত্যিকারের আনন্দ পাচ্ছে।

রণজয় এমনই মন দিয়ে সিনেমা দেখছিল যে, পেছনে কোনো পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। হঠাৎ একটা মোটা শেকল এসে পড়লো তার বুকের ওপর। তারপর কেউ সেটা টেনে তার গলা বেঁধে ফেললো।

চার-পাঁচ জন লোক ঘিরে ধরলো রণজয়কে।

পেটমোটা শেঠজী লাফাতে লাফাতে বললো, হাত বেঁধে ফেলো। পা বেঁধে ফেলো। পালাতে না পারে!

সরু গৌফওয়ালো একজন লোক হাতে একটা রাইফেল নিয়ে বসলো, এ তো গোরিলাদের চেয়েও অনেক লম্বা। ভালো খেলা দেখানো যাবে।

রণজয় দারুণ দুঃখের গলায় বললো, এ কী শেঠজী, আমাকে বাঁধলেন কেন? আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি?

শেঠজী বললো, ডেঞ্জারাস অ্যানিমাল! তোমাকে কি ছাড়া রাখা যায়!

রণজয় বললো, অ্যানিমাল? আমি মানুষ! আমি বললাম, আমি আপনার এখানে চাকরি করবো। আপনি তখন রাজী হলেন।

শেঠজী বললো, চাকরি তো করবেই। তুমি আমার সার্কাসের দলে চাকরি করবে। তোমাকে খাঁচায় ভরে রাখবো। হাজার-হাজার লোক তোমাকে টিকিট কিনে দেখতে আসবে।

সরু গৌফওয়ালো লোকটি বললো, এ তো মানুষের মতন কথাও বলে। একে বেশি কিছু শেখাতেও হবে না!

রণজয় তার দিকে ফিরে বললো, আমি মানুষ, মানুষের মতন কথা বলবো না? আমি লেখাপড়াও শিখেছি।

সরু গৌফওয়ালো লোকটি বললো, বা-বা-বা-বা-! তা হলে তো আরও ভালো ইংরাজী জানো?

শেঠজী বললো, আমাদের সার্কাস এবার কলকাতায় নিয়ে যাবো। বিদেশে নিয়ে যাবো। কথা-বলা দৈত্য, ইংরাজী-বলা দৈত্য, আর কেউ দেখাতে পারবে?

রণজয় গম্ভীরভাবে বললো, আমাকে ছেড়ে দিন!

শেঠজী বললো, ছাড়া হবে না, তোমায় বেঁধে রাখতেই হবে। এত বড় একটা প্রাণীকে খাঁচায় না রাখলে পুলিশ আপত্তি করবে। তোমার তো কোনো অসুবিধে নেই, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাবে! পঞ্চাশখানা করে রুটি পাবে!

তারপর সে উকিঝুঁকি মেরে বললো, আরে, সেই বাঁটকুলটা কোথায় গেল? ওকেও ধরো! ওকেও কাজে লাগানো হবে!

লোকগুলো আসার সঙ্গে সঙ্গে গুটুলির ঘুম ভেঙে গেছে। সে চেয়ারের তলায় লুকিয়ে পড়েছে।

গৌফওয়ালো লোকটা নিচু হয়ে দেখে বললো, ঐয়ে, ঐয়ে, ইঁদুরের মতন পালাচ্ছে!

শেঠজী বললো, ধর, ধর, ওকে ধর!

রণজয় চৌচিয়ে বললো, গুটিলি, হুই পাল্লা! ধরা দিদি না!

তিন-চারজন লোক মিলে ভাড়া করে গেল গুটিলিকে। কিন্তু তাকে ধরা সহজ নয়। হুঁদুর-বিড়াল খেলার মতন গুটিলি একে-বৈকে এদিক ওদিক ছুটে ওদের হাত এড়িয়ে পালাচ্ছে। এক-একবার তাকে দেখা যাচ্ছে না। আবার ভাড়া খেয়ে সে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে।

এরই মধ্যে কী করে যেন গুটিলি উঠে গেল স্টেজের ওপর। সিনেমাটা এখনো চলছে। পর্দার সামনে দিয়ে দৌড়ে চল গেল গুটিলি। দু'জন লোক লাফিয়ে উঠে প্রায় তাকে ধরে ফেললো, গুটিলি তখন টিকটিকির মতন তরতর করে উঠে যেতে লাগলো একটা থাম বেয়ে। আর চাঁচাতে লাগল, আমি পুলিশ ডাকবো। পুলিশ ডাকবো!

সরু গোঁফওয়ালা লোকটি রাইফেল তুলে আচমকা একটা গুলি চালানো সেদিকে।

প্রচণ্ড একটা শব্দ আর ধোঁয়া। গুটিলি ধুপ করে পড়ে গেল ওপর থেকে। আর নড়লো না।

শেঠজী ফ্যাকাশে গলায় বললো, মেরে ফেললে?

সরু গোঁফওয়ালা বললো, ঐ বেঁটেটাকে নিয়ে এতক্ষণ সময় নষ্ট করে কী হবে? এই দৈত্যটাকে এফুগি চালান করে দেওয়া দরকার। রণজয়ও উঠে দাঁড়িয়ে কান্না-মেশানো গলায় বললো, মেরে ফেললে? এবার আমি তোমাদের ছাড়বো না। তোমাদের আমি কোনো ক্ষতি করিনি। তবু তোমরা আমাকে মানুষের মতন বাঁচতে দিতে চাও না!

একটা জোরে ঝাঁকুনি দিতেই মট মট করে ছিঁড়ে গেল রণজয়ের হাতের শিকল। সে গলার শিকলটা হাত দিয়ে টানটানি করতে লাগলো।

সরু গোঁফওয়ালা লোকটা বললো, সাবধান! এদিকে এক পা এগোবে না। হাত দুটো মাথার ওপর তোলো!

রণজয় তার কথা গ্রাহ্য না করে খুলে ফেললো গলার শেকল। অন্য দু'জন লোক ভাঙা তুলে মারতে গেল তাকে, রণজয় তাদের একজনকে শুন্যে তুলে মারলো এক আছাড়!

তারপর সে সরু গোঁফওয়ালা লোকটার দিকে এগিয়ে গেল!

সেই লোকটি বললো, মাথার ওপর হাত তোলো। নইলে তোমার বুকে গুলি করবো। এক গুলিতে তুমি ছাত্ত হয়ে যাবে!

শেঠজী বললো, মেরো না, ওকে মেরো না! ওকে বাঁচিয়ে রাখলে

অনেক রোজগার হবে।

রণজয় সরু গোঁফওয়ালা দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, তুমি আমার বন্ধুকে মেরেছো। তোমাকে আমি শেষ করবো!

সরু গোঁফওয়ালা লোকটি ভয় পেয়ে দড়াম করে চালিয়ে দিল গুলি!

ধোঁয়া সরে যাবার পর দেখা গেল রণজয় এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে প্রচণ্ড রাগে।

শেঠজী আমার দু'তিনজন একসঙ্গে বলে উঠলো, গুলি লাগেনি!

রণজয় বললো, কোনো গুলি আমার শরীর ভেদ করতে পারে না।

তারপরেই যেন শুরু হয়ে গেল একটা প্রলয় কাণ্ড!

রণজয় এক-একটা চেয়ার তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগলো ঐ লোকগুলোর দিকে। ওরা ভয়ের চোটে হুড়োহুড়ি করে পালাতে গিয়েও আছাড় খেয়ে পড়ে গেল জড়াজড়ি করে। রণজয় প্রত্যেককে তুলে তুলে মাথা ঝুঁকে দিতে লাগলো দেয়ালে।

তারা অজ্ঞান হয়ে গেলেও রণজয়ের রাগ কমলো না। সে তবু ভাঙতে লাগলো সব চেয়ার। সিনেমার পদটি ছিঁড়ে ফালা-ফালা করে ফেললো। তারপর গুলির কাছে গিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, হায়, হায়, প্রিয় বন্ধু, তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে!

গুলি অমনি তড়াক করে উঠে বসে বললো, আমার গায়ে আসলে লাগেনি। আমি মটকা মেরে পড়েছিলাম।

রণজয় বললো, তুমি বেঁচে আছো! বাঁচলে আমাকে? তোমাকে ছাড়া আমি কি করে বাঁচতাম! কিন্তু এ কী হলো! আমরা শহরে এলাম চাকরি করতে, আর এরা আমাকে খাঁচার ভরে রাখতে চাইলো?

গুলি বললো, শহর এরকমই! শহরে সবাই খাঁচার মধ্যেই থাকে। দেখছো না, বাড়িগুলোও কেমন খাঁচার মতন! চলো, আমরা জঙ্গলেই যাই।

দু'জনে বাইরে বেরুতেই দেখলো, সেখানে বিরাট একটা ভিড় জমে গেছে!

সেই ট্রাক ড্রাইভার সর্দারজী অনেক লোককে যোগাড় করেছে এর মধ্যে। রণজয়কে দেখেই সে বলে উঠলো, পাকড়ো, পাকড়ো! পাকড়ো! গোরিলা! গোরিলা! দৈত্য!

রণজয় দু'হাত তুলে বললে, ভাইসব, ভয় নেই, আমি গোরিলাও না, দৈত্যও না। আমি কারুর কোনো ক্ষতি করবো না।

অনেকে একসঙ্গে ইট-পাথর ছুঁড়ে মারলো তার দিকে।

রণজয় দু’তিনবার একই কথা বোঝাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কেউ যেন তার কথা বুঝতেই পারছে না। রণজয় যখন চোঁচিয়ে কথা বলে, তখন মেঘের আওয়াজের মতন শোনায।

জনতা এমন চ্যাঁচামেচি করছে যে, রণজয়ের কথা কেউ শুনছেই না। কয়েকটা পাথরের টুকরো লাগলো গুটুলির মাথায়। তার কপাল কেটে রক্ত বেরতে লাগলো।

তখন রাগে অন্ধ হয়ে রণজয় একটা লম্বা বাঁশ তুলে নিয়ে বললো, আজ সবাইকে শেষ করবো।

গুটুলি বললো, শুধু-শুধু মানুষ মেরে লাভ নেই, বন্ধু। চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সে এক দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়লো ট্রাকটায়। রণজয়ও বাঁশ ফেলে এসে ড্রাইভারের সীটে বসলো। সর্দারজী ছুটে এসে বললো, আরে, আরে, আমার ট্রাক নিয়ে ভাগছে! পাকডো, পাকডো!

রণজয় হাত বাড়িয়ে সর্দারজীকে এক ধাক্কা দিতেই সে ছিটকে পড়ে গেল অনেক দূরে।

ট্রাকটা এবার গর্জন করে বেরিয়ে গেল। কিছু লোক পেছন-পেছন ছুটে এসেও ধরতে পারলো না।

কিছুদূরে এসে ফাঁকা রাস্তায় পড়বার পর রণজয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

গুটুলি বললো, দুঃখ করো না, বন্ধু। জঙ্গলই আমাদের ভালো।

রণজয় বললো, মানুষ কেন আমাদের দেখলেই মারতে আসে! শুধু চেহারার জন্যে? আমরা কি কোনো দোষ করেছি?

গুটুলি বললো, দ্যাখো, জঙ্গলের পশু-পাখি, গাছ-পালা, তারা আমাদের ভালোবাসে, নদীর জলে তোমার আর আমার মুখের ছায়া পড়লেও নদী তো রাগ করে না।

রণজয় বললো, তা বলে কি আর আমরা কোনোদিন মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবো না? চিরকাল জঙ্গলে নিবাসিনে থাকতে হবে?

গুটুলি চুপ করে গেল। দু’জনেরই মন খারাপ। সর্দারজীর আর শেঠজীর কথায় তারা খুব বিশ্বাস করেছিল। ওরা যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে, গুটুলিরা একবারও ভাবতে পারেনি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ করে গাড়ি চালালো রণজয়। সে যে কোন রাস্তায় যাচ্ছে, তা জানে না। যে-কোনো একটা দিকে গেলেই হলো। কোথাও একটা গভীর বন দেখলে সেখানে থামবে।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। হঠাৎ রাস্তার ধারের একটা গ্রামের নাম লেখা বোর্ড দেখে রণজয় বলে উঠলো, আরেঃ !

গুটুলি বললো, কী হলো ?

রণজয় বললো, গুটুলি, আমার আর এই দেশে থাকতেই ইচ্ছে করে না। এখানে একবার একটা জায়গায় যাবো। যদি সেখানেও খারাপ ব্যবহার পাই, তাহলে আর কোনোদিন এদেশে ফিরবো না।

গুটুলি জিজ্ঞেস করলো, এখানে কোন জায়গায় ?

রণজয় বললো, এসোই না !

ট্রাকটা সে একটা ছোট রাস্তায় ঢোকালো। তারপর অনেকগুলো বাঁক ঘুরে সে এসে থামলো একটা বাগানের ধারে।

ট্রাক থেকে নেমে রণজয় গুটুলির হাত ধরে নিয়ে এলো একটা পুকুরপাড়ে। কাছেই একটা ছোট দোতলা বাড়ি, সামনে ছোট্ট উঠোন, তার মাঝখানে তুলসীমঞ্চ।

রণজয় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেই বাড়িটার দিকে।

গুটুলি জিজ্ঞেস করলো, এটা কাদের বাড়ি ?

রণজয় ধরা গলায় বললো, এই বাড়িতে আমি জন্মেছি। এখানে আমি বড় হয়েছি। এখান থেকেই অন্য গ্রহের মানুষরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

কত কষ্ট করে আমি ফিরে এসেছিলাম কিন্তু আমার চেহারাটা বদলে গেছে, কেউ আমায় আর চিনতে পারেনি। সবাই আমাকে দেখে ভয় পায়। গ্রামের মানুষ আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। আমার দাদা আমাকে চিনতে পারলেও বলেছিল, তুই এখান থেকে চলে যা, রণজয়। তুই দৈত্য হয়ে গেছিস। মানুষের মধ্যে তুই আর থাকতে পারবি না !

এই সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো একটা বাচ্চা ছেলে। আট ন' বছর বয়েস, ফুটফুটে চেহারা, হাতে একটা ব্যাডমিন্টনের র্যাকেট।

রণজয় ফিসফিস করে বললো, আমার দাদার ছেলে, ওর নাম পিক্লু।

গুটুলি জিজ্ঞেস করলো, ও তোমাকে চিনতে পারবে ?

রণজয় কোন উত্তর দেবার আগেই ছেলেটি দেখতে পেয়ে গেল তাকে। চোখ দুটো কপালে উঠে গেল। চিৎকার করতে গিয়েও মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ হলো না। ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। ধপাস করে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

রণজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমার আজও ফেরা হলো না রে, গুটুলি ! আমার প্রিয়জনেরাও আমাকে দেখে ভয় পায় ! তুই পিক্লুকে কোলে করে বাড়ির দরজায় রেখে আয়।

রণজয় বিষন্ন মনে আবার উল্টোদিকে হাঁটতে লাগলো।



আজব লড়াই

www.banglabookpdf.blogspot.com



আজব লড়াই

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে রণজয় দেখল, তার হাত দুটো যেন কী দিয়ে বাঁধা। অথচ দড়ি বা শিকল-টিকল কিছু নেই। হাত দুটো ছড়াতে গিয়েই সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো। যেন দুটো ব্লেন্ড তার হাতের চামড়া কেটে দিচ্ছে।

তার পা দুটোরও সেই অবস্থা। সে পা ফাঁক করতে পারছে না। কিন্তু কী দিয়ে যে পা বাঁধা, তাও বোঝা যাচ্ছে না। রণজয় এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, তার পাশে গুটুলি নেই, কেউ নেই। মস্ত বড় একটা শিমুল গাছের তলায় সে আগে যেমন শুয়ে ছিল, সেই রকম ভাবেই শুয়ে আছে।

অতিকষ্টে সে উঠে বসল। হাত দুটোকে মুখের কাছে এনে সে দেখল, একটা চুলের মতন সরু কোনো সুতো দিয়ে তার কবজিদুটো বাঁধা হয়েছে, কিন্তু চুল নয়, সেই সুতোটার রং নীল, তাই তার চামড়ার মধ্যে একবারে মিশে গেছে। রণজয় আর-একবার একটু টানবার চেষ্টা করেই বুঝল, এই সুতো ছেঁড়ার সাধ্য তার নেই। টানতে গেলেই তার হাতের চামড়া কেটে যাচ্ছে।

রণজয় যেই বুঝতে পারল যে, সে বন্দী, অমনি তার সারা গায়ে ঘাম এসে গেল। সাধারণ কোনো মানুষ তাকে বন্দী করতে পারে না, মোটা-মোটা লোহার শিকলও রণজয় এক হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলেছে এর আগে। কিন্তু সে এই সরু সুতো ছিঁড়তে পারছে না? এত সরু আর এত শক্ত সুতো কি পৃথিবীতে পাওয়া যায়?

উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। রণজয় চিৎকার করে ডাকল, গুটুলি! গুটুলি!

কেউ সাড়া দিল না।

গুটুলি রণজয়ের প্রিয় বন্ধু, সে কখনো রণজয়কে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে না। নিশ্চয়ই তাকেও কেউ বন্দী করে নিয়ে গেছে।

রণজয়ের দারুণ খিদে পেয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠলেই তার খিদে পায়।

আর বাচ্চা বয়েসের মতন বেশি খিদে পোলেই তার কান্না এসে যায়, যদিও তার চেহারাটা এখন রূপকথার দৈত্যের মতন।

হঠাৎ পাতার ওপর খসখস শব্দ হতেই রণজয় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দুজন মানুষ সমান তালে পা ফেলে হেঁটে আসছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। তারা দুজনে চ্যাংদোলা করে ধরে আছে একটা হরিণকে। হরিণটা বেঁচে আছে, ছটফট করছে। ওরকম একটা জ্যান্ত হরিণকে ধরে রাখা সহজ নয়, কিন্তু লোক দুটো যেন হরিণটার ছটপটানি গ্রাহ্যই করছে না।

লোক দুটির গায়ের রং নীল!

রণজয়ের সব রোম খাড়া হয়ে গেল। এদের সে চিনতে পেরেছে। এরা সপ্তম গ্রহ বলয়ের প্রাণী, এরা একবার রণজয়কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এরা আবার ফিরে এসেছে।

লোক দুটি রণজয়ের কাছে এল না, তার পেছন দিকে জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল। একটু পরে সে দেখতে পেল একটি লোককে, তার এক হাতে একটা জ্যান্ত খরগোশ, অন্য হাতে একটা টিয়া পাখি। আশ্চর্য ব্যাপার, এরা জ্যান্ত হরিণ, খরগোশ, টিয়াপাখি ধরছে কি করে?

এই লোকটি রণজয়ের সামনে এসে দাঁড়ালো। এর মাথায় একটাও চুল নেই, মুখে দাড়ি-গোঁপ নেই, ডুক নেই, চোখের পল্লবও নেই। সে কিড়মিড় করে কী যেন বলল।

রণজয় ওদের গ্রহে একবার ঘুরে এলেও ওদের ভাষা বোঝে না। ওদের দু'একজনের কাছে একটা যন্ত্র আছে, সেটা হাতে নিলে মনে মনে কথা বললেও বোঝা যায়।

লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে অবশ্য বোঝা গেল, সে রণজয়কে তার সঙ্গে যেতে বলছে। কিন্তু রণজয় তো উঠে দাঁড়াতেই পারছে না।

লোকটি দু'বার ধমক দেবার পর রণজয়ের আরও কাছে এসে তার কোলের ওপর একটি পা দিয়ে দাঁড়ালো। লোকটির পায়ের জুতো দেখলে মনে হয়, স্টিলের তৈরী, কিন্তু রবারের মতন নরম।

হাত খোলা থাকলে রণজয় একটা থাপ্পড় দিয়ে লোকটাকে শত হাত দূরে পাঠিয়ে দিতে পারতো। এত সাহস যে, রণজয়ের গায়ে পা দেয়!

লোকটি রণজয়ের হাত-বাঁধা সুতোটার একটা দিক খুঁজে নিল। তারপর সেটা ধরে টানতেই রণজয় আবার বাঁধা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। লোকটি তা গ্রাহ্য না করেই সেই সুতোটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল রণজয়কে। রণজয় মাটিতে গড়াতে লাগল, মাঝে-মাঝে পাথর আর গাছের

ডালপালায় তার সারা গা ছুড়ে গেল। কিন্তু তার বাধার দেবার কোনো উপায় নেই।

জঙ্গলটা যেখানে বেশ ঘন, সেখানে রয়েছে সেই গোল চকচকে একটা আকাশ-যান। এই রকেটটা রণজয় চেনে। ঠিক এই রকম রকেটে করেই নীল মানুষরা একবার তাকে নিয়ে গিয়েছিল মহাশূন্যে। আবার তাকে সেখানে যেতে হবে? তাহলে আর কি কোনোদিন ফেরা যাবে?

লোকটি সামনে এসে দাঁড়াতেই গোল রকেটের একটা গোল দরজা খুলে গেল। রণজয়ের মনে পড়ল, ওরা যে গ্রহে থাকে, সেখানে সবকিছুই গোল-গোল।

দরজাটা খুলতেই লোকটা টিয়া পাখি আর খরগোশটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ভেতরে। তারপর রণজয়ের দিকে তাকাল।

রণজয়ের হাতের চামড়া কেটে রক্ত পড়ছে। সে বুঝতে পারল, বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই, তাতে শুধু তার কষ্টই বাড়বে। সে নিজেই ঢুক পড়ল রকেটটার মধ্যে।

ভেতরটা যেন একটা চিড়িয়াখানা।

সেখানে একটা করে গরু, ঘোড়া, মোষ, হরিণ, নানা রকমের পাখি, একটা চিতাবাঘ, কয়েকটা সাপ, ব্যাঙ, ছাগল, প্রজাপতি, ফড়িং, এইসব জন্তু-জানোয়ার পোকা-মাকড়ে ভর্তি।

একটা পাতলা ধোঁয়ায় ভরে আছে ভেতরটা, তাতে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। সেই ধোঁয়ার জনাই বোধহয় জন্তু-জানোয়ারগুলো সবাই এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, কেউ ছটফট করছে না।

এক কোণে বসে আছে গুটুলি। সে অজ্ঞান হয়ে যায়নি। কিন্তু রণজয়কে দেখেও কোনো কথা বলল না, শুধু তার চোখ দুটো বড় হয়ে গেল।

যে লোকটি রণজয়কে টেনে এনেছিল, সে এবার রণজয়ের হাত ও পায়ের সুতোর বাঁধন খুলে দিল। তারপর ধমক দিয়ে কী যেন বলল।

রাগে রণজয়ের পিণ্ডি জ্বলে গেল। এই লোকগুলো পৃথিবী থেকে নানারকম জন্তু-জানোয়ারের স্যাম্পল নিয়ে যেতে এসেছে নিজেদের গ্রহে। তা বলে কি তারা মানুষও ধরে নিয়ে যাবে? পৃথিবীর মানুষকেও এরা জন্তু মনে করে?

এই লোকগুলো কেউই রণজয়ের মতন লম্বা নয়। কিন্তু রণজয় জানে যে, এদের মধ্যে কে-যে রক্তমাংসের প্রাণী আর কে-যে যন্ত্র-মানুষ, তা বোঝবার উপায় নেই। এই যন্ত্র-মানুষরাও একরকম নরম ধাতু দিয়ে তৈরি,

তাই এদের হাত-পা মানুষের মতনই মনে হয়। কিন্তু এদের গায়ে অসম্ভব শক্তি।

একটি মেয়ে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। তার হাতে একটি ছোট গোল রেডিওর মতন যন্ত্র। সেই যন্ত্রটা মুখের কাছে এনে সে কিছু বলল। রণজয় এবার পরিষ্কার বাংলায় শুনতে পেল, এই-যে পলাতক। আবার আমাদের দেখা হলো, আমায় চিনতে পারো?

রণজয় মেয়েটাকে চিনতে পেরেছে। মহাকাশের বহুদূরে, সৌরলোক থেকে কোটি-কোটি মাইল পেরিয়ে এদের নীল রঙের গ্রহে রণজয় একসময় বন্দী ছিল। সেই সময় এই মেয়েটিই পাহারা দিত তাকে। ওদের গ্রহে ছেলেরা আর মেয়েরা সমান কাজ করে। এই মেয়েটির চোখে ধুলো দিয়েই রণজয় কোনো রকমে পালাতে পেরেছিল।

রণজয় বলল, আমাকে পলাতক বলছো কেন? আমি তো এই পৃথিবীরই মানুষ! তোমরা আমাকে বন্দী করেছিলে, আমি আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছি।

মেয়েটি হেসে বললে, তুমি আর পৃথিবীর মানুষ নও। নিজের চেহারা কি তুমি দেখতে পাও না? তোমার গায়ের রং নীল! তুমি কত লম্বা! পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে তোমার কোনো মিল নেই আর। তুমি আমাদেরই একজন হয়ে গেছ। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো, আমাদের গ্রহে থাকবে। সেখানে তোমাকে কত আদর-যত্ন করবো।

রণজয় বলল, আমার চেহারাটা বদলে গেলেও আমার মনটা রয়ে গেছে মানুষের মতন। আমি এই পৃথিবীকেই ভালবাসি। আমার দেশকে ভালবাসি। এই পৃথিবীর গাছপালা, আলো-হাওয়া, জল সব আমার প্রিয়। তোমাদের ওখানে একটাও গাছ নেই। জল নেই। আমার ভাল লাগে না।

মেয়েটি বলল, কিন্তু তোমাদের এই পৃথিবীতে খাবার পাওয়া যায় না। এখনো কত মানুষ খেতে পায় না। এখানে একদিকে বিদ্যুৎ গরম, আর একদিকে বিদ্যুৎ ঠাণ্ডা। এই পৃথিবীটা মোটেই ভাল গ্রহ নয়। আমাদের ওখানে তুমি যখন যা খুশি চাও, খেতে পাবে। যে-কোনো আরাম চাও, সব পাবে। তুমি আমাদের ওখানে গিয়ে আর কিছুদিন থাকলে আর কখনো এই বিজ্জিরি পচা পৃথিবীতে ফিরতে চাইবে না।

রণজয় বলল, ভাল হোক খারাপ হোক, এই পৃথিবীতে আমি জন্মেছি। এই পৃথিবীই আমার প্রিয়। আমাকে কেন জোর করে নিয়ে যেতে চাইছো? আমি এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে চাই না।

মেয়েটি এবার জোরে হেসে উঠে বলল, এবার আর তুমি ফিরে আসতে পারবে না। নীল মানুষ, এবার তোমার মনটা আমরা বদলে দেবো। পৃথিবীর কথা তোমার আর মনেই পড়বে না।

একটা গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে রণজয় বুঝতে পারল এবার রকেটটা ছাড়বার উদ্যোগ করছে। আর বেশি সময় নেই। একবার পৃথিবীর মাটি ছেড়ে উড়তে শুরু করলেই এমন প্রচণ্ড গতি এসে যাবে যে, প্রায় চোখের নিমেষেই উড়ে যাবে মহাশূন্যে।

রণজয় মিনতি করে বলল, তোমরা সভ্য শিক্ষিত প্রাণী, তবু তোমরা ডাকাতি করতে আসো কেন? মানুষকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া অন্যায়, তা তোমরা বোঝো না?

মেয়েটি বলল, অন্যায়? সে আবার কী? এ কথাটার মানেই তো আমরা জানি না। আমাদের যখন যেটা ইচ্ছে হয়, তখন সেটা করি।

রণজয়ের পাশের লোকটি তার নিজের ভাষায় কী যেন বলে রণজয়ের হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সে হাতটা ছেড়ে দিয়ে যেন ব্যথা পেয়ে উঃ করে উঠল।

রণজয়ের হাতটা ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত আর ঘামে ভেজা। সেই হাতটা ধরেই লোকটা ছেড়ে দিয়েছে। রণজয়ের মনে পড়ে গেল, এরা কোনো তরল জিনিস সহ্য করতে পারে না। হঠাৎ জলের মধ্যে পড়ে গেলেই এরা মরে যায়। প্রথমবার রণজয় যখন কেঁদে ফেলেছিল তখন তার চোখের জলের কয়েকটা ফোঁটায় ওদের একজনের হাত পুড়ে গিয়েছিল।

আর সময় নেই, আর সময় নেই। রকেটটা এন্ট্রুনি উড়বে। রণজয়ের কাছে একটাই মাত্র অস্ত্র আছে।

সে ঘুরে দাঁড়িয়েই পাশের লোকটির গালে থুঃ করে খানিকটা থুতু ছিটিয়ে দিল।

লোকটা বিকট একটা আত্ননাদ করে দমাস করে পড়ে গেল মেঝেতে। সেই থুতু যেন তার গায়ে বুলেটের মতন লেগেছে।

ওদের দলনেত্রী ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। সে তার নিজের ভাষায় অন্য লোক দুটিকে কী যেন আদেশ করল। সেই লোক দুটি রণজয়কে ধরবার জন্য এগিয়ে আসতেই রণজয় এক লাফে চলে গেলে দেয়ালের দিকে। মুখ সরু করে সে খুব জোরে দুবার থুঃ থুঃ করল। একটা ফস্কে গেল, অন্য লোকটির গায়ে থুতু লাগতেই সে আগুনে পোড়া মানুষের মতন ছটফট করতে লাগল। বাকি লোকটি কোমরে হাত দিল একটা অস্ত্র তোলাবার জন্য।

রণজয় মুখখানা ঝুঁকিয়ে ঠিক তার মুখের ওপর এক দলা থুতু ঝুঁড়ে দিল। সেই লোকটি আকাশ ফাটানো চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ওদের দলনেত্রী এবার কঠোর গলায় বলল, যথেষ্ট হয়েছে। ওতে পলাতক নীল মানুষ, তুমি এবার শান্ত হব, না এই মুহূর্তে তোমাকে শেষ করে দেবো?

সেই মেয়েটির হাতে একটা ছোট্ট গোল মতন অস্ত্র। রণজয় জানে, ওর থেকে ঝলকে ঝলকে নীল আগুন বেরোয়। সেই নীল আগুন মানুষ তো দূরের কথা, ইস্পাত পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারে।

রণজয়ের গলা শুকিয়ে গেছে। মুখে আর থুতু নেই থাকলেও অতদূরে তার থুতু পৌঁছোতো না। আর কোনো উপায় নেই, এবার তাকে হার স্বীকার করতেই হবে। ঐ গোল যন্ত্রটার সঙ্গে কোনো চালাকি চলে না।

মেয়েটি বলল, আস্তে আস্তে বসে পড়ো। দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাও। এবার তোমাকে অজ্ঞান করে ফেলতে হবে, দেখছি। তোমাকে ভাল কথা বললেও....

মেয়েটির কথা শেষ হলো না, সে আঁ আঁ করে চিৎকার করে উঠল।

রণজয় দেখল, গুটুলি কখন চুপি চুপি মেয়েটির পেছন দিকে চলে গেছে।

এবার সে লাফিয়ে উঠে পেছন থেকে মেয়েটির মুখখানা ধরে তার দুই কানের মধ্যে থুতু ছিটিয়ে দিচ্ছে।

মেয়েটি মেঝেতে পড়ে যেতেই রণজয় এক লাফে গিয়ে রকেটের দরজাটা খুলে ফেলল। রকেটটা সবে মাত্র মাটি ছাড়তে শুরু করেছে। রণজয় চিৎকার করে বলল, গুটুলি লাফিয়ে পড়! তারপর নিজেও সে ঝাঁপ দিল!

রণজয় আর গুটুলি দুজনেই পড়ল একটা বড় গাছের ওপর। তারপর গড়াতে গড়াতে ডালপালার মধ্যে দিয়ে খসে পড়ল মাটিতে। খুব বেশি তাদের লাগেনি।

গুটুলি বলল, ওস্তাদ, ওরা কি আবার ফিরে আসবে?

রণজয় বলল, ঐ রকেট একবার শূন্যে উঠে গেলে ফিরে আসতে সময় লাগে। তার আগেই আমরা পালাবো। দাঁড়া, একটু জিরিয়ে নিই। এখনো বুক ধড়ফড় করছে রে! এরকম ভাবে যে বাঁচতে পারবো, কল্পনাও করিনি!

গুটুলি থুঃ থুঃ করে নিজের হাতে দুবার থুতু ছিটিয়ে বলল, ওস্তাদ, সত্যিই থুতুর এত শক্তি? কোনোদিন তো বুঝিনি!

রণজয় বলল, থুতু এমনি-এমনি খরচ করিস না! ভবিষ্যতে আবার কাজে লাগতে পারে।

ইচ্ছা গ্রন্থ

www.banglabookpdf.blogspot.com



ইচ্ছা গ্রন্থ

জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছে। একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই গাড়িটার দিকে তাকিয়ে গুটুলি বললো, ইস, কতদিন আইসক্রিম খাইনি!

রণজয় পা ছড়িয়ে বসে আছে একটা গাছতলায়। সে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ তোর আইসক্রিমের কথা মনে পড়লো যে?

গুটুলি বললো, কি জানি! হঠাৎ আইসক্রিমে কথা ভেবে মনটা হ-হ করে উঠলো!

রণজয় বললো, এই জঙ্গলে তুই আইসক্রিম পাবি কোথায়?

গুটুলি বললো, আমরা কাছাকাছি যে গ্রামগুলোতে রাত্তিরবেলা চুপিচুপি যাই, সেখানেও কেউ আইসক্রিম বানায় না।

রণজয় বললো, আইসক্রিম পাওয়া যায় শহরে। দূর দূর, আমি আর কিছুতেই কোনো শহরে যাবো না!

গুটুলিও অবশ্য শহরে যেতে চায় না। শহরের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে ওদের দু'জনেরই। রণজয় আট ফিট লম্বা, সাধারণ মানুষের প্রায় দেড় গুণ, আর গায়ের রংটা নীল। তাকে দেখলেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দৈত্য ভেবে ভয় পায়, আর বড়োরা তাকে মারতে আসে। চেহারাটা বদলে গেলেও সে যে অন্যদের মতনই একজন মানুষ, তা কেউ বোঝে না। আর গুটুলি দারুণ বেঁটে। রণজয়ের কোমরের চেয়েও নীচে থাকে। তাকে দেখলে সবাই হাসে আর মাথায় চাঁটি মারে। অথচ অন্য মানুষদেরই মতন গুটুলির দুঃখ আছে, ভালোবাসা আছে।

চেহারা দিয়ে যে মানুষকে বিচার করা যায় না, তা বেশির ভাগ মানুষই আজও বোঝে না!

রণজয় জিজ্ঞেস করলো, কী গাড়ি যাচ্ছে রে?

গুটুলি বললো, একটা বাস। তাতে কত মানুষ বসে আছে। বাসটা থামিয়ে ওদের একটু ভয় দেখাবে?

বাসটা থামানো রণজয়ের পক্ষে খুবই সহজ। রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেই হলো। কোনো গাড়িই তার অত বড় শরীরটাকে ধাক্কা মেরে সরতে পারবে না। তা ছাড়া গাড়ির ড্রাইভাররা হঠাৎ তাকে দেখেই আঁতকে ওঠে। যারা ভূত-প্রেতে একদম বিশ্বাস করে না, তারাও ভাবে এই একটা সত্যিকারের ভূত!

রণজয় বললো, ওদের ভয় দেখিয়ে কী হবে!

গুটুলি বললো, তবু খানিকটা সময় কাটবে। খানিকটা হাসা যাবে। কিছুই যে করার নেই।

রণজয় বললো, ও খেলাটাও আর ভালো লাগে না। তুই আইসক্রিম খেতে চাইলি, তার একটা ব্যবস্থা করা যাক। এক কাজ করলে হয়। খানিকটা দুধ আর বরফ খেয়ে নিলেই তো পেটের মধ্যে গিয়ে আইসক্রিম হয়ে যাবে!

গুটুলি খানিকটা নাকি কান্নার সুরে বললো, নাঁ, আমি ওঁ রকম চাই না, আঁসল আইসক্রিম খাবো।

রণজয় বললো, তাহলে তো আইসক্রিম বানাতে হয়! দাঁড়া অন্ধকার হোক!

রাত্রি গভীর হলে রণজয় গুটুলিকে কাঁধে নিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে চুপিচুপি একটা গ্রামে ঢুকলো। সবাই এখন ঘুমিয়ে আছে। শুধু দু'চারটে কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো রণজয়কে দেখে। রণজয় একবার ঘুরে দাঁড়াতেই কুকুরগুলো ভয়ে লাজ তুলে পালালো।

এ গ্রামের একটা মিষ্টির দোকান ওরা আগে থেকেই চেনে। মাঝে মাঝে ওরা এরকম রাত্রিরে এসে এই দোকান থেকে চুরি করে মিষ্টি খেয়ে যায়। ঠিক চুরি নয়, তার বদলে ওরা জঙ্গল থেকে অনেক আম, কাঁঠাল ও নানারকম ফল রেখে যায় এখানে। আজ এনেছে দু'ছড়া কলা।

প্রথমে ওরা দু'জনে টপাটপ করে কিছু রসগোল্লা আর সন্দেশ খেয়ে নিল। জঙ্গলে শুধু পাখির মাংস আর খরগোশের মাংস আর ফলমূল খেতে খেতে ওদের একঘেয়ে লাগে। একটা ডাকাতকে ওরা রাঁধুনি হিসেবে রেখেছিল, সে পালিয়েছে।

মিষ্টি খেয়ে পেট ভরাবার পর রণজয় বললো, ঐ দ্যাখ্, একটা কড়াই-ভর্তি দুধ জ্বল দেওয়া আছে।

গুটুলি বললো, না, আমি দুধ খাবো না!

রণজয় বললো, তোকে দুধ খেতে হবে না। কী করে এর খানিকটা দুধ সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যায়, দ্যাখ্ তো! কিছু পাত্র-টাত্র আছে?

গুটলি বললো, একটা ডেকচি আছে, দেখছি। ঢাকনাও আছে।

রণজয় বললো, ডেকচিটাতে দুধ ভরে ভালো করে মুখটা বেঁধে নে।
ছলকে যেন না পড়ে।

রণজয় নিজেই এক ঠোঙা চিনি আর একটা দেশলাইও খুঁজে নিল।
তারপর বললো, চল গুটলি, আমি আইসক্রিম বানাবো!

গুটলি জিজ্ঞেস করলো, বরফ কোথায় পাবে?

রণজয় বললো, পৃথিবীতে কি বরফের অভাব আছে? কত পাহাড়—!

যে-জঙ্গলে ওরা থাকে, তার পেছনে পাহাড় আছে বটে, কিন্তু সেখানে
বরফ নেই। বরফের টুপি-পরা পাহাড় অনেক দূরে।

গুটলিকে কাঁধে নিয়ে রণজয় একটার পর একটা পাহাড় পেরিয়ে যেতে
লাগলো। ওদের তো আর কোনো কাজ নেই। এখন আইসক্রিম বানাবার
ঝোঁকটা পেয়ে বসেছে।

বরফের পাহাড়ে পৌঁছলো পরদিন সন্ধ্যাবেলা।

কোথাও কোনো জন-মনুষ্য নেই, জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে জমে আছে
বরফ। শীতকাল, তাই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার দরকার নেই, অনেক নীচেই
বরফ রয়েছে।

গুটলিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রণজয় খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিল।

গুটলি বললো, দোকানটা থেকে আমি একতাল ছানাও নিয়ে এসেছি।

এই নাও দাদা, ছানা খেয়ে গায়ে একটু জোর করে নাও!

রণজয় বললো, তুই খা। ছানা খেতে আমার বিচ্ছিরি লাগে। আমি
আইসক্রিম বানিয়ে তবে খাবো।

কী করে আইসক্রিম বানাতে হয়, জানো?

খুব সোজা। দুখটা ফুটিয়ে ফ্রীজের মতন করতে হবে, তার মধ্যে চিনি
আর বরফ মেশালেই দেখবি চমৎকার আইসক্রিম হয়ে যাবে। কুলপি-মালাইও
হতে পারে। যা চাইবি!

দুটো সমান সাইজের পাথর যোগাড় করে উনুন বানালো রণজয়। গুটলি
কিছু শুকনো কাঠ-কুটো এনে গুঁজে দিল তাতে। আগুন জ্বালিয়ে ডেকচিটা
চপানো হলো।

কাঠগুলো ভিজে, তাই আগুন নিভে যাচ্ছে বারবার।

গুটলি মাটিতে শুয়ে পড়ে ফুঁ দিয়ে আবার আগুন ধরাচ্ছে। রণজয়
চেয়ে আছে সামনের দিকে। হঠাৎ সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো।

কাছেই খোলা জায়গায় জমে আছে চাপ-চাপ বরফ। একটু-একটু জ্যোৎস্না

পড়েছে তার ওপর। চাঁই-চাঁই বরফ যেন আপনা-আপনি শূন্যে উঠে যাচ্ছে।
এ আবার কী ব্যাপার?

রণজয় ভালো করে লক্ষ্য করলো।

এবার দেখতে পেল, একটা মস্ত বড় লোহার হাত যেন মুঠো মুঠো করে সেই বরফ তুলে নিচ্ছে।

অন্য যে-কেউ এ দৃশ্য দেখলে ভয় পেত। কিন্তু রণজয়ের ভয়-ভর নেই। সে বললো, গুটুলি, তুই দুখটা জ্বাল দে, আমি একটু আসছি।

রণজয় আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

তার চোখের ভুল নয়, সত্যিই একটা প্রকাণ্ড লোহার হাত বরফ তুলে নিয়ে যাচ্ছে পেছন দিকে।

রণজয় বুঝতে পারলো, এটা একটা রোবটের হাত। হাতটা যদি এত বড় হয়, তাহলে রোবটটা কত বড়!

রণজয় আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। রোবটটাকে দেখতে পেল না, আবছা আলোয় তার চোখে পড়লো, খানিকটা সমতল জায়গার ওপর রয়েছে একটা গোলমতন রকেট। সেই রকেটের ভেতর থেকে লোহার হাতটা বেরিয়ে এসে বরফ তুলছে, তুলে ফেলে দিচ্ছে রকেটের মধ্যে।

বাইরে থেকে কারো যেন বরফ চুরি করতে এসেছে!

কোনো মানুষ বা অন্য ধরনের প্রাণীদের দেখা যাচ্ছে না, শুধু যেন রকেটের কাছাকাছি কয়েকটা জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে। বেশ বড় ধরনের জোনাকি!

গুটুলি একা থাকতে ভয় পায়। বরফ ভোলার শব্দ শুনে সেও ছুটে এলো রণজয়ের কাছে। ব্যাপারটা দেখে সে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো, দাদা, এটা কী হচ্ছে?

রণজয় বললো, রাঙিরের অন্ধকারে পৃথিবীতে কত কী যে ঘটে যায়, মানুষ টেরও পায় না। বুঝতে পারছিস না, অনা গ্রহের প্রাণীরা এসে আমাদের বরফ নিয়ে যাচ্ছে। এই রকম ভাবে বোধহয় গাছপালা, নদীও নিয়ে যায়। আজকাল প্রায়ই শুনিস না, জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে, নদী মরে যাচ্ছে, সে সব এদেরই কীর্তি!

গুটুলি বললো, দাদা, পালিয়ে চলো। অত বড় লোহার হাত!

রণজয় বললো, ভয়ের কী আছে, এই চুরি আটকাতে হবে না?

রণজয় তার বজ্রের মতন গম্ভীর গলায় হুকার নিল, এই, কে রে? কে বরফ চুরি করে?

সঙ্গে সঙ্গে সেই লোহার হাত এদিকে ঘুরে এলো। একসঙ্গে রণজয় আর গুটুলিকে মুঠোয় ভরে তুলে নিল শূন্যে। রণজয়ের শরীরে অসীম শক্তি, তবু সে ছাড়াতে পারলো না নিজেকে। লোহার হাতটা ওদের ঝুঁড়ে দিল রকেটের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই জ্ঞান হারালো।

॥ ২ ॥

জ্ঞান ফেরার পর রণজয় ধড়মড় করে উঠে বসলো। সে শুয়েছিল খোলা আকাশের নীচে। গুটুলি ঘুমিয়ে আছে তার পাশে। ঠিক রোদ্দুরও নয়, ছায়াও নয়, একটা আবছা-মতন আলো রয়েছে চারদিকে। আকাশের রং কালো। মেঘলা আকাশে যে-রকম কালো হয়, সে রকম নয়, সম্পূর্ণ আকাশটাই স্নেট রঙের।

রণজয়ের বুঝতে দেরি হলো না যে, তারা একটা অন্য গ্রহে এসে পড়েছে। তাতেও রণজয় ভয় পেল না। এরকম অভিজ্ঞতা তার আগেও অনেকবার হয়েছে।

গুটুলির দিকে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো অবাক হয়ে। এই বেঁটে লোকটিকে সে চেনে বটে, কিন্তু কিছুতেই ওর নাম মনে করতে পারছে না। রণজয়ের নিজেরই নাম কী? তাও মনে নেই।

গুটুলিকে সে ধাক্কা দিয়ে জাগালো।

গুটুলি উঠে চোখ রগড়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটা কোন জায়গা?

রণজয় বললো, সেটা পরের কথা। আমাকে তুমি চেনো?

গুটুলি বললো, বাঃ, তোমাকে চিনবো না কেন? এ কী জিজ্ঞেস করছো? তুমি তো তুমি!

আমার নাম কী?

তোমার নাম? তাই তো, তাই তো, মনে পড়েছে না।

হঁ! আমরা কোথা থেকে এসেছি, মনে আছে?

আমরা কোথা থেকে এসেছি? এই বাঃ! জানি না তো! তুমি বলে দাও!

আমরা কোথা থেকে এসেছি, তাও মনে নেই? এই জায়গাটা অচেনা লাগছে, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা অন্য কোথাও ছিলাম। সেই জায়গাটা কেমন?

কিছু মনে পড়েছে না যে!

রণজয় এবার একটু দমে গেল। কোন জায়গা থেকে এসেছে, তাই-ই

যদি মনে না থাকে, তা হলে ফিরবে কী করে ?

গুটুলি একটুখানি সামনে ঘুরে এলো। কোনো গাছ বা প্রাণী কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাটিটা নরম, কিন্তু কাদা নেই।

গুটুলি বললে, খিদে পেয়েছে। কতদিন ভাত খাইনি। গরম গরম ভাত...

রণজয় বললো, ইস, আইসক্রিম খাওয়া হলো না।

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতন কাণ্ড ঘটলো। কোথা থেকে দুটো থালা ফুটে উঠলো ওদের সামনে। তার একটাতে ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাত। আর একটাতে আইসক্রিম।

ওদের একেবারে চম্কে ছানাবড়া !

রণজয় বললো, আমাদের নাম মনে নেই। কোথা থেকে একসঙ্গে এসেছি, তা মনে নেই। কিন্তু ভাত আর আইসক্রিমের কথা মনে থাকলো কী করে ?

গুটুলি বললো, কী জানি !

ভাতের সঙ্গে আর কী খায় ?

মনে নেই। এগুলো কে দিয়ে গেল ?

তা কী করে জানবো ?

ভাতটা গরম, আইসক্রিমটা ঠাণ্ডা। এ দুটোকে কি একসঙ্গে খায় ? তাও জানি না।

খিদে পেয়েছে, খেয়ে তো নিই !

গুটুলিই আগে ভাতের সঙ্গে আইসক্রিম মিশিয়ে দলা পাকিয়ে মুখে দিয়ে বললো, আঃ ! চমৎকার !

দু'জনে খুব তাড়াতাড়ি সবটা শেষ করে ফেললো।

তারপর দু'জনেই হেঁটে দেখতে লাগলো জায়গাটা। রণজয়ের বুকে ফাঁকা ফাঁকা আর হালকা লাগছে। অনেক কথা তার মনে নেই। ভাত আর আইসক্রিম ছাড়া আর একটা খাবারের কথাও মনে পড়ছে না। অন্য কোনো মানুষের মুখ মনে পড়ছে না। জঙ্গল বা পাহাড়ের কথা মনে পড়ছে না।

এই গ্রহটা একেবারে সমতল। মানুষের থাকার মতন কোনো বাড়িঘর চোখে পড়ছে না। অনেক দূরে প্রকাণ্ড কয়েকটা কারখানা আছে, মনে হলো। মাঝে মাঝে শূন্য দিয়ে উড়ে যাচ্ছে রকেট। কয়েকটা অদ্ভুত ধরনের গাড়িও চলে গেল ওদের পাশ দিয়ে, কিন্তু তার যাত্রীদের দেখা যাচ্ছে না। শুধু ভেতরে জেনাকির মতন আলো জ্বলছে আর নিভছে।

খানিকটা দূরে একটা মাঠের মধ্যে ঘুরছে কয়েকটা গরু, ছাগল, ঘোড়া,

জিরাফ, জেব্রা, খরগোশ, আরও অনেক জন্তু, যা ওরা আগে কখনো দেখেনি। গরু-ছাগল-ঘোড়াগুলো দেখে ওরা চিনতে পারলেও তাদের নাম মনে নেই।

রণজয় একটা গরুর দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটা কী?

গুটুলি বললো, এটা, এটা, এটা, তাই তো কী এর নাম?

রণজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমরা অনেক কিছু ভুলে গেছি।

এ কোন এক ভোলার দেশে এসে পড়লাম।

সেখানে ওদের কেটে গেল তিন দিন।

মাটিতেই শুয়ে থাকতে কোনো অসুবিধে নেই। এখানে রোদ ওঠে না, বৃষ্টি পড়ে না। যে-কোন জায়গায় গেলে কেউ বাধা দেয় না।

ওরা খায় শুধু গরম ভাত আর আইসক্রিম। খিদে পেলে ঐ দুটোর কথাই মনে পড়ে, অমনি দুটো খালা-ভর্তি চলে আসে।

রণজয় বুঝতে পেরেছে যে, এই গ্রহের অধিবাসীদের মানুষের চোখের লেন্সে দেখা যায় না। মানুষের কাছে তারা অদৃশ্য। শুধু তাদের চোখগুলো জোনাকির মতন জ্বলে-নেভে।

এখানে ইচ্ছাশক্তির খুব জোর আছে। ইচ্ছেটাই বস্তু হয়ে যায়। কিন্তু যে, কোন কারণেই হোক, স্মৃতিশক্তি এমনই কমে যায় এখানে যে, বেশি কিছু স্মৃতিতে থাকেই না।

এখানে থাকার কোনো অসুবিধা নেই। যেখান থেকে এসেছে, সেই পৃথিবীর কথা ওদের একটুও মনে নেই, তবু বুকের মধ্যে টনটন করে। কিসের যেন একটা দুঃখ ঘুমের মধ্যেও ওদের সঙ্গে থাকে।

এখানকার মাটি নরম। হাত দিয়ে দাগ কাটা যায়। গুটুলি একদিন নানা রকম দাগ কাটছে, হঠাৎ রণজয় বললো, দাঁড়ও, দাঁড়ও, এই যে তিনটে দাগ কাটলে এটা কিসের মতন দেখাচ্ছে বলো তো!

গুটুলি বললো, জানি না তো!

রণজয় বললো, একটা সোজা দাগ, আর বাঁ পাশে দুটো দাগ কোনাকুনি জোড়া। এটা হলো ব।

ব? তার মানে কি?

ব হলো একটা অক্ষর। আমরা যে কথা বলি, তার ব।

ঠিক তো। আমরা যে কথা বলি, তা লেখাও যায়। ব, তারপর কী মনে করতে পারছি না।

ব-এর পাশে একটা হাতের মতন দিলে ক হয় না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক। ঠিক ক-এর মানে কী ?

তা তো জানি না। তা হলে দুটো পেলাম, ব আর ক। বক! বক!
খুব চেনা-চেনা লাগছে। বক বলে কিছু একটা আছে, না ?

হ্যাঁ, আছে। ওড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বক ওদের সামনে দিয়ে উড়ে গিয়ে মাটির ওপর
বসলো।

ওরা দু-জন তাকালো পরস্পরের দিকে। এবার স্পষ্ট হয়ে গেল যে,
এখানে যে-কোন জিনিসের নাম উচ্চারণ করলেই সেটা বাস্তব হয়ে উঠবে।
সেদিন আর কিছু মনে পড়লো না।

পরদিন সকাল থেকে প্রবল উদামে মাটিতে দাগ কাটতে লাগলো রণজয়।
বারবার লিখছে ব আর ক, বক, বক। আর প্রত্যেকবার ম্যাজিকের বক
উড়ে যেতে লাগলো সেখান দিয়ে।

অনেক আঁকিবুকি কাটার পর আবার একটা অক্ষর চিনতে পারলো
রণজয়। ন।

গুটুলিও বললো, ন। হ্যাঁ, ন!

রণজয় ক, এর পাশে ন বসালো। তারপর কন। কন মানে কি ?

গুটুলি বললো, তা তো জানি না! তুমি ব এর পাশে বসাও তো!
রণজয় সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, বন, বন! বন মানে কি ?

গুটুলি বললো, জানি জানি! বড় বড় গাছপালা। আমরা সেখানে ছিলাম।

ঠিক বলেছিস, গাছ! গাছ খুব লম্বা হয়। অনেক হাত থাকে।

ঐ দ্যাখো। একটা গাছ!

যেমন ভাবে বক উড়ে গিয়েছিল, সেই রকমভাবে পরপর কয়েকটা গাছ
গজিয়ে গেল সামনে। গজাতেই লাগলো, একটা বন হয়ে গেল।

রণজয় বললো, বন কোথায় ছিল। ভাবো তো। সেটা অন্য গ্রহ। সেটার
নাম কী ?

গুটুলি বললো, বনের পাশে ছিল পাহাড়। বরফ!

রণজয় শূন্যে এক লাফ দিয়ে বলে উঠলো, মনে পড়েছে। পৃথিবী!
পৃথিবীতে বরফ থাকে। বন থাকে। মানুষ থাকে। গরু-ছাগল-ঘোড়া থাকে।
সব হয়ে থাকে।

তক্ষুনি বিরাট এক গর্জন শোনা গেল। যেন শত শত বজ্রপাত হচ্ছে।
মাটি দুলছে। রণজয় আর গুটুলি চোখে অন্ধকার দেখলো, চোখ ঢেকে
শুয়ে পড়লো।

খানিকবাদে থেমে গেল সব আওয়াজ। মাটিও আর কাঁপছে না।

চোখ মেললো ওরা দু'জন।

আবার বিষম অবাক হবার পালা। ওদের সামনে তৈরী হয়ে গেছে এক পাহাড়! তার গায়ে কিছু কিছু জঙ্গল। সামনে ছড়ানো আছে বরফ।

একটা ডেকচিতে দুধ ফুটছে!

রণজয় বললো, তোর নাম তো গুটুলি। আমার নাম রণজয়। মনে পড়ে গেছে। দাখ গুটুলি, এই জায়গাটা আমাদের পৃথিবীর মতন হয়ে গেছে। অবিকল একরকম।

গুটুলি বললো, কিন্তু এই দুধের ডেকচিটা? মিষ্টির দোকান থেকে এনেছিলাম, সেটাও এখানে এলো কী করে?

রণজয় বললো, সেটাও এখানে তৈরী হয়ে গেছে। আমরা যা ভাববো, তাই-ই হয়ে যাবে। ভালোই হলো, অন্য একটা গ্রহ আমাদের পৃথিবীর মতন হয়ে গেল!

গুটুলি বললো, দাদা, এটা কি অন্য গ্রহ? নাকি আমাদের সেই পৃথিবীটা? দাখো, দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি পর্যন্ত পড়ে আছে। আমরা তো দেশলাইয়ের কথা বলিনি!

রণজয় বললো, তাই তো! তাহলে কি ওরা আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে গেল?

গুটুলি বললো, ফিরিয়ে দিল? আমরা কি কোথাও গিয়েছিলাম, না এখানেই ছিলাম? তিন চার দিন ধরে কী এই দুধ ফুটছে? অথচ কত আইসক্রিম খেলাম!

রণজয় বললো, আমার আঙুলের কোণে ভিজে-ভিজে মাটি কেন? আমি মাটিতে আঁকিবুকি কাটছিলাম। এখানে তো মাটি নেই, শুধু পাথর! তা হলে?

গুটুলি বললো, কী জানি দাদা, কিছুই বুঝতে পারছি না!

ওরা বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলো পরস্পরের দিকে।

পৃথিবীতে নীল মানুষ

www.banglabookpdf.blogspot.com



পৃথিবীতে নীল মানুষ

রণজয়কে অন্যগ্রহের প্রাণীরা বারবার ধরে নিয়ে যায়। কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেয় না। তারা মনে করে, রণজয় এই পৃথিবীর মানুষ নয়। অথচ রণজয় পৃথিবীকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে।

আরও একবার রণজয় ধরা পড়লো ওদের হাতে। গুটিলি কিংবা রঘু জানতেও পারেনি, ঘুমের মধ্যে ওরা রণজয়কে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রণজয়কে আটকে রাখা সহজ নয়। কোন বন্ধনই সে মানে না।

রণজয় আবার ফিরে এসেছে পৃথিবীতে।

কী করে যে সে বেঁচে গেল, তা সে নিজেই জানে না। অন্য গ্রহের রকেটটা এলোমেলোভাবে ঘুরছিল মহাশূন্যে। যে পুতুল মেয়েটি রকেট চালাচ্ছিল সে হঠাৎই থেমে গিয়েছিল এক সময়। আর নড়ে না, চড়ে না। ওদের বোধহয় কোনো রকম দম দেবার ব্যাপার আছে। নির্দিষ্ট সময়ের পর দম ফুরিয়ে গেলেই অকেজো হয়ে যায়। তখন সে সত্যিই পুতুল।

রণজয় রকেট চালাতে জানে না, সেই জন্য তার আর পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা ছিল না। সে ভেবেছিল, মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতেই তার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে।

তারপর এক সময় রকেটটা বিস্ফোরণ হলো। রকেটটা টুকরো টুকরো হয়ে যেতেই রণজয়ও ছিটকে পড়লো বাইরে। অজ্ঞান হবার আগের মুহূর্তে সে ভাবলো, এই তা হলে শেষ?

আসলে, রকেটটা কোনো রকমে পৃথিবীর বায়ুস্তরে হঠাৎ একবার ঢুকে পড়তেই ফেটে যায়। সেই সঙ্গে যে রণজয়ও মরে গেল না, তার কারণ সে তো আর মানুষ নয়! অন্য গ্রহের প্রাণীদের একটা গোল বল ছুঁয়ে ফেলার জন্য সে এখন একদম বদলে গেছে। এখন সে প্রায় আট ফুট লম্বা একটা দৈত্য, তার গায়ের রং আকাশের মতন নীল, শরীরে অসম্ভব শক্তি।

অজ্ঞান অবস্থায় একটা পালকের মতন ভাসতে ভাসতে রণজয় নেমে এলো পৃথিবীতে। সে কোনো বাড়ির ছাদ কিংবা কোনো রাস্তায় গাড়িঘোড়ার মাঝখানেও পড়তে পারতো। সে রকম কিছু হলে বেশ একটা মজার ব্যাপারই হতো।

কিন্তু রণজয় এসে পড়লো একটা নদীর ধারে। অর্ধেকটা শরীর জলে আর অর্ধেকটা মাটিতে। তখন শেষ রাত, সেই জন্য আকাশ থেকে কেউ তাকে নামতে দেখে নি।

রণজয়ের মাথাটা জলের মধ্যে পড়েছিল বলেই তার তক্ষুনি জ্ঞান ফিরে এলো। খড়মড় করে উঠে বসে ভাবলো, তা হলে আমি এখনো বেঁচে আছি?

প্রথমে সে বুঝতেই পারলো না, এটা কোন জায়গা? নতুন কোনো গ্রহ হতে পারে। এর আগে মহাকাশে অনেক গ্রহ সে দেখেছে। প্রত্যেকটাতেই কিছু-না-কিছু বিপদ আছে।

রণজয় একটা ঝোপের আড়ালে লুকোলো।

প্রথমে এলো একটা কুকুর। রণজয় অবাক হয়ে গেল। এটা তো তার চেনা প্রাণী। অন্য গ্রহেও কি কুকুর আছে? রণজয় বিশ্বাসই করতে পারছে না যে, সে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে।

ভোরের আলো ফোটবার পরও রণজয়ের সন্দেহ কাটলো না। কয়েকজন মানুষকে দূর থেকে দেখে তার মনে হলো, হ্যাঁ, এটা অন্য কোনো নতুন গ্রহই হবে।

আসলে রণজয় যে, নদীর ধারে পড়েছে, সেই নদীর নাম ইরাওয়াডী। দেশটা হলো বার্মা। এখানকার মানুষরা ফর্সা-ফর্সা, চ্যাপ্টা নাক, চোখ ছোট, লুঙ্গি আর ব্লাউজের মতন পোশাক, সেই জন্য রণজয় চিনতে পারে নি। সে অনেক গ্রহেতে ঘুরেছে, কিন্তু এই পৃথিবীতে বাংলা ছাড়া আর কোনো দেশ তো দেখে নি। বার্মিজদের ভাষাও সে বুঝতে পারছে না।

ঝোপের আড়ালে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকবার পর রণজয় বুঝলো যে, এরকম ভাবে তো সময় কাটলে চলবে না। বাঁচবার জন্য চেষ্টা করতেই হবে। যোগাড় করতে হবে খাবার।

এই মানুষের মতন চেহারার প্রাণীগুলি কি তার শত্রু? অবশ্য এদের ছোট্টখাটো চেহারা, এরা আট-দশজন মিলেও রণজয়কে কাবু করতে পারবে না।

একটা ছোট্ট সাম্পান নৌকো এসে থামলো তার কাছেই। নৌকোতে

ভর্তি রয়েছে কলা। দু'জন বর্মী মাঝি নৌকোটা চালিয়ে এনেছে।

রণজয় ঘোষ থেকে বেরিয়ে নৌকোটার কাছে যেতেই বর্মী মাঝি দুটির চোখ প্রায় কপালে উঠে গেল। এ তারা কী দেখছে? একটা নীল রঙের দৈত্য?

রণজয় বললো, আমার খিদে পেয়েছে। কয়েকটা কলা দেবে?

রণজয়ের বাংলা কথা তো তারা বুঝলোই না। তারা দুহাতে কান চাপা দিল।

রণজয় জানে না যে, তার গলার আওয়াজটাও সাঙ্ঘাতিক বদলে গেছে। সে কথা বললেই মেঘ ডাকার মতন শব্দ হয়।

রণজয় আর এক পা এগোতেই বর্মী মাঝি দুজন ভয়ের চোটে ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে।

রণজয় আর খিদে সামলাতে না পেরে টপাটপ করে কলা তুলে খেতে লাগলো। সে ভাবলো, বাঃ, এর স্বাদ তো পৃথিবীর কলারই মতন।

আমরা যেমন চীনেবাদাম খাবার সময় গুনি না যে, কীটা খাচ্ছি, সেই রকমই রণজয় আপন মনে পঞ্চাশ-ষাটটা কলা খেয়ে ফেললো। তারপর তৃপ্তির সঙ্গে বললো, আঃ।

বর্মী মাঝি দুজন কিন্তু ভীতুন। তারা প্রথমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লোও সাঁতরে একটু দূরে গিয়ে উঠলো। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে চলে এলো নৌকোর কাছে। একটা দৈত্য তাদের সব কলা খেয়ে নিচ্ছে দেখে তারা আর রাগ সামলাতে পারলো না। এই নদীতে খুব ডাকাতির ভয় আছে বলে ওরা সব সময় কাছে একটা করে ছুরি রাখে। দু'জনে দুটো ছুরি হাতে নিয়ে তেড়ে এলো রণজয়ের দিকে।

একজনের ছুরি গাঁখে গেল রণজয়ের পিঠে। আর একজনের হাত সে ধরে ফেললো। তারপর একটা ঝাঁকুনি দিতেই সে অজ্ঞান। অন্য লোকটা এবার কাঁপতে শুরু করেছে। একটা ছুরি অতখানি বসিয়ে দেবার পরও দৈত্যটা একটু উঃ পর্যন্ত করলো না।

রণজয় সেই লোকটিকে দুহাতে ধরে উঁচুতে তুললো। তারপর কটমট করে তাকিয়ে বললো, দেবো শেষ করে?

এতেই সেও জ্ঞান হারালো।

রণজয় অবশ্য ওদের মেরে ফেলতে চায় নি। নিজের পিঠ থেকে ছুরিটা তুলে এনে সে দেখলো মনোযোগ দিয়ে। পৃথিবীর মানুষের ছুরিরই মতই তো! নৌকো, মানুষ, কলা, ছুরি, তা হলে কি এই জায়গাটা পৃথিবী?

অজ্ঞান লোক দুটিকে নৌকোটাতে চাপিয়ে নৌকোটা জোরে ঠেলে দিল রণজয়। সেটা আপনাআপনি ভেসে চললো। খানিক বাদে জ্ঞান হলো ঐ মাঝি দু' জন বোধহয় ভাববে যে, ওরা দুজনেই একটা দারুণ দুঃসপ্ন দেখেছে।

রণজয় বুঝতে পারলো, তার পক্ষে দিনের বেলা চলাফেরা করা সম্ভব নয়। সবাই তাকে দেখে ভয় পাবে কিংবা মারতে আসবে। সে তো কারুর সঙ্গে শত্রুতা করতে চায় না, সে শুধু বাঁচতে চায়। তার চেহারাটা যে বদলে গেছে, সেটা কি তার দোষ?

সারাটা দিন নদীর ধারেই কাটিয়ে দিল সে। তার খুব মন খারাপ লাগছে। তার খুব ইচ্ছে করছে, একটা নরম বিছানার শুয়ে ঘুমোতে। একটু ভাত-ডাল মাছের ঝোল খেতে। কতদিন সে ভাত খায় নি।

রাত্রির গভীর হবার পর রণজয় হাঁটতে লাগলো। অনেকক্ষণ হাঁটার পর এসে পৌঁছেলো একটা শহরের কাছাকাছি। অনেক রাত হলেও এখনো দু' একটা গাড়ি চলছে, কয়েকটা দোকানের দরজা বন্ধ থাকলেও ভেতরে জ্বলছে আলো।

খুব সাবধানে দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে এগোতে লাগলো রণজয়। পড়বার চেষ্টা করলো দোকানের সাইনবোর্ড। বেশীর ভাগই বার্মিজ ভাষায় লেখা, এক জায়গায় পাওয়া গেল ইংরেজী ভাষাতে রণজয় বুঝলো, এই শহরটার নাম প্রোম।

রণজয় যদিও বি.এ. পাস, তবু প্রোম শহরটা কোন দেশে তার মনে পড়লো না। আরও একটুখানি গিয়ে একটা প্যাগোডা দেখতে পেয়ে সে বুঝতে পারলো, তা হলে তো সে বামায় এসে পড়েছে।

তার মনটা দমে গেল।

এই বামা মূলুকে সে এখন কী করবে? তার মন টানছে বাড়ির দিকে। এখান থেকে তার বাড়ি যে অনেক দূর।

এর মধ্যেই রণজয়ের আবার খিদে পেয়ে গেছে।

খাবার পেতে হলে কারুর-না-কারুর কাছ থেকে তাকে জোর করে কেড়ে নিতে হবে। অথচ সে তো চুরি-ডাকাতি করতে চায় না। কিন্তু আর উপায়ই বা কী?

হঠাৎ দুম্ দুম্ করে গুলির শব্দ হতেই রণজয় একটা গলির মধ্যে ঢুক পড়লো। তারপর উঁকি দিয়ে দেখলো, তিনজন লোক একটা গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা দোকানের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। দোকানের ভেতর থেকেও কেউ চালাচ্ছে গুলি। কাছাকাছি কয়েকটা বাড়ির জানলা খুলে গেছে, রাস্তায়

এসে পড়েছে আলো। কিন্তু কোনো লোক বাইরে বেরিয়ে এলো না।

খানিকক্ষণ গুলির যুদ্ধ চলবার পর দোকানের ভেতর থেকে আর কোনো গুলি এলো না। রাস্তার তিনটে লোক গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পিস্তল হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল দোকানটার দিকে।

এবার রণজয়ও গলি ছেড়ে চলে এলো সেখানে।

পিস্তলওয়ালা লোক তিনটি দোকানের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে যেতেই রণজয় পেছন থেকে দুজনের কাঁধ চেপে ধরলো।

লোক দুটি মুখ ফিরিয়ে রণজয়কে দেখেই চৌচিয়ে উঠলো আঁ আঁ করে।

রণজয় মাথা ঠুকে দিল লোক দুটির। ইচ্ছে করেই সে খুব জোরে ঠুকে দেয় নি, তা হলে ওদের মাথা ছাতু হয়ে যেত একেবারে।

তৃতীয় লোকটিও পেছন ফিরে এত অবাক হয়ে গেছে যে, গুলি ছুড়তে ভুলে গেছে।

এবার রণজয় ওর দিকে হাত বাড়াতেই লোকটি কী যেন বলে উঠে গুলি চালালো।

গুলি লাগলো রণজয়ের বাঁ হাতের তালুতে। সাধারণ লোক এ রকম অবস্থায় যত্নশীল অস্থির হয়ে বসে পড়ে। কিন্তু রণজয়ের তেমন কিছু ব্যথা লাগলো না। বরং খানিকটা বিরক্ত হলো। সে অন্য হাত দিয়ে সেই লোকটিকে এমন জোরে একটা চড় কষালো যে লোকটা তিন-চার পাক ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়েই অজ্ঞান। আগের দুটো লোকেরও কোনো সাজা নেই।

যে সব বাড়ির জানলা খুলে গেছে, সেখান থেকে অনেকেই নিশ্চয়ই দেখছে এই দৃশ্য। তারা কী ভাবছে, কে জানে? হয়তো তারা নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

রণজয় এবার দোকানটার ভেতর ঢুকে দেখলো, একজন বুড়ো মতন লোক রক্তাক্ত অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার পাশে একটা রাইফেল। হয়তো বাইরের ঐ লোক তিনটির সঙ্গে এর কোনো পুরোনো শত্রুতা ছিল।

রণজয় হাঁটু গেড়ে বসে লোকটির নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখলো, এখনো নিঃশ্বাস পড়ছে। একটা গুলি লেগেছে বুড়ো লোকটির কাঁধে। তবে রণজয় দেখলো, গুলিটা ভেতরে গাঁথে যায়নি, ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে।

দোকানটা নানা রকম খেলনার জিনিসপত্রের। পেছন দিকে আর-একটা ঘর। রণজয় সেই ঘরে ঢুকে দেখলো, সেটা ঐ বুড়ো লোকটির শোবার ঘর। সেখান থেকে একটা তোয়ালে এনে জলে ভিজিয়ে রণজয় লোকটির ক্ষতস্থানটা মুছে কোনো রকমে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। রণজয়ের নিজেরও

বাঁ হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে, কিন্তু সে এখানে বেশী সময় নষ্ট করতে চায় না।

আবার পাশের ঘরে গিয়ে একটা ফ্রিজ খুলে দেখলো, তার মধ্যে অনেকগুলো ডিম রয়েছে। আর কিছু আলু। একটা কাগজের বাগ্মতে ডিম আর আলুগুলো ভরে, রণজয় একটা দেশলাই খুঁজতে লাগলো। তাও পেয়ে গেল। তখন সেগুলো নিয়ে সে বেরিয়ে এলো বাইরে। বুড়ো লোকটির সে প্রাণ বাঁচিয়েছে, এই কটা জিনিস নিলে সে নিশ্চয়ই রাগ করবে না।

দূরে কয়েকটা গাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই পুলিশ আসছে। লম্বা-লম্বা পা ফেলে রণজয় দৌড় লাগালো উল্টো দিকে।

রণজয় থামলো একটা জঙ্গলে এসে।

কাঠকুটো জড় করে এবার সে আগুন জ্বালতে পারবে। কিন্তু আলু আর ডিমগুলো সেদ্ধ করবে কী করে? কোনো ডেকচি কিংবা হাঁড়ি তো আনে নি। ইস, খুব ভুল হয়ে গেছে তো!

বর্মী-জঙ্গলে দুজনের কাছ থেকে একটা ছুরি রণজয় নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল। এই জঙ্গলে অনেক বুনো কলাগাছ আছে। সেই ছুরি দিয়ে রণজয় একটা কলাপাতা কেটে আনলো। শুকনো কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বলে তার মধ্যে ফেলে দিল আলুগুলো। তারপর ডিমগুলো ভেঙে ভেঙে গুলতে লাগলো কলাপাতায়। তারপর সেই কলাপাতাটা আগুনের ওপর একটু উঁচু করে খানিকক্ষণ ধরে রাখতেই দিবি ওমলেট হয়ে যেতে লাগলো।

আলু-পোড়া আর ডিম-ভাজা দিয়ে খাওয়াটা মন্দ হলো না। একটু নুন থাকলে আরও চমৎকার হতো।

সেখানেই শুয়ে পড়ে রণজয় মনে মনে ঠিক করলো, পায়ে হেঁটেই সে বর্মা দেশ ছেড়ে ভারতে ঢুকবে।

বর্মা দেশে জঙ্গলের অভাব নেই। এর পর কদিন ধরে রণজয় দিনের বেলা কোনো জঙ্গলে ঘুমোয় আর রাত্তিরে হাঁটে। মধ্যে একদিন ঘুমের মধ্যে একটা বিরাট পাইথন সাপ জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। জেগে উঠে সে সাপটার মুখটা চেপে ধরে খুব জোরে নিঃশ্বাস নিতেই সেটা দড়ির মতন ছিঁড়ে গেল পটপট করে।

রণজয়ের একটা চিন্তা ছিল যে সীমান্তটা পার হবে কী করে? সীমান্তে তো মিলিটারি থাকে তারা যদি গুলি চালায়?

কিন্তু জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রণজয় যে কখন ভারতবর্ষে এসে পড়েছে তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি। জঙ্গলের বাঘ, ভাল্লুক, হরিণদের তো পাসপোর্ট

লাগে না, তারা অনায়াসেই এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যেতে পারে। জঙ্গলের মধ্যে সব জায়গায় মিলিটারির পাহারাও থাকে না।

এক রাত্তিরে একটা শহরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রণজয় দেখলো, সেখানকার একটা দোকানে বাংলা অক্ষরে নাম লেখা। রণজয় চমকে উঠলো, তা হলে সে বাংলায় পৌঁছে গেছে?

সেটা আসামের একটা শহর। বাংলা আর অসমীয়া ভাষার অক্ষর তো একই রকম। আরও দু' একটা দোকান দেখার পর সেটা বুঝতে পেরেও খুব আনন্দ হলো রণজয়ের। আসামে পৌঁছোলে আর বাংলা কতদূর।

সেই রাতেই সে জঙ্গলের মধ্যে একজন লোকের মুখোমুখি পড়ে গেল।

রণজয় একটা গাছে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। আসামের জঙ্গলে ঘুমোনো বড় মুশকিল। বড্ড জোঁক। মাঝে মাঝেই গা থেকে টেনে টেনে জোঁক ছাড়াতে হয়। তবু একটু ঘুম এসেছিল, একটা গুলির শব্দে সে চমকে উঠলো।

তারপরেই সে দেখলো, একটা হরিণ হুড়মুড় করে ছুটে এসে প্রায় তার কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। রণজয় উঠে গিয়ে হরিণটাকে ধরতে যেতেই টর্চের আলো ফেলে ছুটে এলো একজন লোক।

লোকটি পরে আছে একটা খাকি হাফ-প্যান্ট আর গেঞ্জি। এক হাতে রাইফেল, অন্য হাতে টচ। রণজয়কে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটি বললো, এ কি?

লোকটি রাইফেল তুলতেই রণজয় বললো, গুলি করে কোনো লোভ হবে না। যদি বাঁচতে চান, তবে চুপ করে আমার কথা শুনুন আগে।

লোকটি ভয় না পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে?

রণজয় কথা বললেই মেঘ ডাকার মতন আওয়াজ হয় বলে এবার সে ফিসফিস করে বলে, আমি একজন মানুষ। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি দৈত্য নই, ভূত-প্রেত কিছু নই।

লোকটি বললো, মানুষ? এরকম কোনো মানুষ হয়?

রণজয় বললো, একটা দুখটিনায় আমার চেহারা এরকম হয়ে গেছে। পরে সব বুঝিয়ে বলতে পারি। এবার বলুন, আপনি কে?

লোকটি একটি চা-বাগানের ম্যানেজার। এই জঙ্গলটা সেই চা-বাগানের সঙ্গেই ওদেরই সম্পত্তি। এই জঙ্গলে অন্য কারুর ঢোকা নিষেধ।

সব শুনে রণজয় বললো, আপনি আমাকে দেখে ভয় পান নি, সেজন্য অনেক ধন্যবাদ। বিশ্বাস করুন, আমি কারুর কোনো ক্ষতি করতে চাই

না। আমার চেহারাটা এরকম হলেও আমি অন্যদের মতনই একজন সাধারণ মানুষ। আমি রাতের পর রাত হেঁটে, জঙ্গলে থেকে থেকে খুবই ক্লান্ত। আমাকে আপনার বাড়িতে একটু আশ্রয় দেবেন? আমি একটু বিছানায় শুতে চাই, বাড়ির রান্নাকরা খাবার খেতে চাই। তার বদলে আপনি যা বলবেন, সেই কাজ আমি করে দিতে পারি।

ম্যানেজারটি বললেন, এসো।

রণজয় মরা হরিণটি কাঁধে তুলে নিয়ে চললো ম্যানেজারের পেছনে পেছনে।

বাংলোর কাছাকাছি এসে ম্যানেজার বললেন, তোমাকে দেখলেই তো আমার সব লোকজন ভয় পেয়ে যাবে। তুমি চুপিচুপি ঐ পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে ওপরে চলে যাও, তারপর আমি আসছি।

ম্যানেজারটি অবিবাহিত। বাংলোর নীচতলায় অনেক আদালি আর বেয়ারা থাকে, ওপরের তলাটা ফাঁকা। সেখানে তিনি রণজয়কে অনেক রকম খাবার খেতে দিয়ে বললেন, এবার শোনাও তো তোমার কাহিনীটা। তুমি সত্যিই মানুষ, না অন্য গ্রহের প্রাণী?

রণজয় নিজের সব ঘটনা খুলে বললো, একে একে। ম্যানেজার চোখ গোল-গোল করে শুনে গেলেন। ঠিক যেমন ভাবে বাচ্চা ছেলেরা রূপকথার গল্প শোনে।

অনেক কিছু খাওয়ার পর রণজয়ের ঘুম পেয়ে গেল। ম্যানেজার বললেন, ঠিক আছে। আজ রাতটা ঘুমিয়ে কাটাও, কাল সকালে আবার শোনা যাবে। কিন্তু কোনো খাটে তো তুমি আঁটিবে না। মেঝেতে কতকগুলো তোশক পেতে দিচ্ছি, সেখানে ঘুমোও বরং।

নিজেই তিনি অন্য ঘর থেকে তিনচারখানা তোশক বয়ে আনলেন। সেগুলো জোড়া দিয়ে বিছানা পাতা হলো, রণজয় শুয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে।

প্রায় তার মনে পড়ে গুটিলির কথা। এই পৃথিবীতে গুটিলিই তার একমাত্র বন্ধু। কিন্তু কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে তাকে?

একটু বাদে ম্যানেজারবারুটি এক গেলাস শরবত নিয়ে এসে বললেন, তুমি তো খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে, এই শরবতটা খেয়ে নাও, কাল সকালে একেবারে চান্দা হয়ে যাবে।

রণজয় যখন ঢকঢক করে শরবত খেতে লাগলো, তখন মুচকি হাসলেন ম্যানেজার।

পরদিন রণজয়ের ঘুম ভাঙলো প্রায় দশটার সময়। ঘুম নয়। আসলে সে অজ্ঞান হয়ে ছিল। ম্যানেজারটি শরৎভের মধ্যে ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

রণজয় দেখলো, তার হাত পা শক্ত দড়ি দিয়ে কাঁধা। ঘরের মধ্যে চার-পাঁচ জন লোক। ম্যানেজারবাবু বললেন, থানায় নবর পাঠিয়েছি। একুনি এসে পড়বে পুলিশের গাড়ি। খবরের কাগজের ফটোগ্রাফারদেরও ডাকতে হবে। ভেবে দ্যাখো তো, সবাই যখন জানলে, তখন কি দারুণ কাণ্ড হবে। আসামের জঙ্গলে অতিকায় মানব! আমার ধারণা, এ নিশ্চয়ই অন্য গ্রহ থেকে এসেছে। এরকম গায়ের রং কোনো মানুষের হয় না। আমিই ওকে আবিষ্কার করেছি। দেখো। রাশিয়া আমেরিকা থেকেও বৈজ্ঞানিকরা আসবে ওকে দেখতে।

একজন বললো, কিন্তু ওকে রাখা হবে কোথায়? এই চা-বাগানে থাকলে তে অনেকেই দেখতে পাবে না।

ম্যানেজার বললেন, ভাবছি গৌহাটির চিড়িয়াখানায় একটা শক্ত লোহার খাঁচায় রাখলে কেমন হয়?

রণজয় উঠে বসে বললো, না!

অন্য লোকেরা সেই গর্জন শুনে ভয়ে দৌড়ে চলে গেল দরজার দিকে। সেখান থেকে একজন বললো, ও ম্যানেজারবাবু এ যে আমাদের মতন কথা বলে।

ম্যানেজার বললেন, অন্য গ্রহের লোকদের পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। ওরা সব ভাষায় কথা বলতে পারে।

তারপর রাইফেলটা, তুলে রণজয়ের দিকে তাক করে বললেন, চুপ করে শুয়ে থাকো, নড়লেই গুলি করবো।

রণজয় হাতের বাঁধনটা টেনে খোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু খুবই শক্ত নাইলনের দড়ি, ছেঁড়া গেল না। তখন সে ম্যানেজারের দিকে তীব্র চক্ষু তাকিয়ে বললো, বিশ্বাসঘাতক! আমাকে আশ্রয় দিয়ে তারপর এই ব্যবহার? কতবার বললাম না যে, আমি মানুষ। আমার চেহারা অন্যরকম হয়ে গেলেও আমার মনটা মানুষেরই মতন! আমাকে কেন চিড়িয়াখানায় রাখবে, আমি তোমাদের কী ক্ষতি করেছি?

ম্যানেজার বললেন, খবরদার! কোনো কথা শুনতে চাই না।

তখনই এসে গেল পুলিশের গাড়ি। রণজয়কে দেখে দারোগা আর দুজন পুলিশের তো চক্ষু ছানাবড়া!

দারোগা বললো, এটা কি মশাই? ব্রহ্মদৈত্য?

রণজয় বললো, না, আমি মানুষ। আমায় ছেড়ে দিন।

তারপর সে কাঁদতে শুরু করলো হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। কান্নায় তার শরীরটা কঁপে কঁপে উঠছে।

দারোগা বললো, আরে, এ যে মানুষের মতন কাঁদে।

রণজয় আবার মুখ তুলে বললো, এবার দেখাচ্ছি আমি মানুষ না অন্য কিছু!

আসলে কান্নার ছল করে মুখ নীচু করে রণজয় হাতের বাঁধনটা দাঁত দিয়ে কাটছিল। তার দাঁতে যথেষ্ট ধার।

একজন অত বড় চেহারার দৈত্যকে হঠাৎ কাঁদতে দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, এরই মধ্যে এক লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে রণজয় দারোগাকে ধরে ফেলে ওপরে তুলে ফেললো। তারপর বললো, কেউ গুলি চালাবার চেষ্টা করলে আপনাকে আছাড় মারবো, একেবারে ছাত্ত হয়ে যাবেন।

দারোগাটি হাত-পা ছুঁড়ে ওরে বাবারে, মারে বলে চিৎকার করতে লাগলো।

রণজয় আবার বললো, কারুক বলুন, আমার পায়ের বাঁধন খুলে দিতে।

দারোগা বললো, ওরে দে, শীগগির দে! আমায় মেরে ফেললে।

একজন কনস্টেবল কাঁপতে কাঁপতে এসে খুলে দিল রণজয়ের পায়ের দড়ি।

রণজয় দারোগাকে সেই অবস্থায় উঁচুতে তুলে রেখে বেরিয়ে এলো ঘরের বাইরে। সবাই ভয়ে তাকে রাস্তা ছেড়ে দিল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে এসে রণজয় দারোগাকে বললো, আমি মানুষের মতন বাঁচতে চাই, আপনারা আমাকে বাঁচতে দেবেন না?

তারপরই দারোগাকে একটা পেয়ারা গাছের ডালের ওপর বসিয়ে দিয়ে সে প্রচণ্ড জোরে দৌড় লাগালো। ম্যানেজারবাবুটি এই সময় রাইফেল টিপ করে দুবার গুলি ছুঁড়লেন বটে, কিন্তু একটাও লাগলো না। ততক্ষণে রণজয় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এর ঠিক এগারো দিন পরের ঘটনা। পশ্চিম বাংলার একটি গ্রামে এক বিধবা মহিলা উঠানের তুলসীমঞ্চ সন্ধেবেলা প্রদীপ জ্বলে দিচ্ছিলেন, এমন সময় কাছ থেকে কে যেন ডেকে উঠলো, মা!

তিনি চমকে উঠে চারদিকে তাকালেন, কিন্তু কারুক দেখতে পেলেন না। তিনি ভাবলেন, তিনি ভুল শুনেছেন।

আবার কেউ ডাকলো, মা!

মহিলা এবার বললেন, কে ?

এবার কেউ গোয়াল ঘরের আড়াল থেকে বললো, মা, আমি তোমার ছেলে !

মহিলাটির বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। এ কি কোনো অপদেবতার খেলা ? তার ছেলে তো নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। সে কি ফিরে এসেছে ? তা হলে আড়ালে কেন ? আর গলার আওয়াজটাই বা এত ভয়ংকর কেন ?

কে তুমি, সত্যি কবর বলো তো ?

মা, আমি সত্যিই তোমার ছেলে। আমার চেহারা বদলে গেছে। আমার গলার আওয়াজ বদলে গেছে। আমায় দেখলে সবাই ভয় পায় কিংবা মারতে আসে। মা, আমি তোমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছি। তুমিও কি আমায় দেখে ভয় পাবে ?

তুই সত্যিই আমার খোকা ? তোকে দেখে আমি ভয় পাবো কেন ? তুই কোথায় চলে গিয়েছিলি ?

সে অনেক কথা মা। তা হলে বলো, তুমি আমায় এখানে থাকতে দেবে ? আমায় দেখে ভয় পাবে না ?

মা কখনো ছেলেকে দেখে ভয় পায় ? আর, আমার কাছে আয়।

এবার উঠানে পড়লো একটা বিরাট কালো ছায়া। তারপর গোয়াল ঘরের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো একটি দৈত্যের মতন মানুষ। সে মায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললো, মা আমি তোমার সেই রণজয়। আমাকে এখানে লুকিয়ে থাকতে দাও, আমি আর কোথাও যাবো না !



www.banglabookpdf.blogspot.com

‘নীললোহিত’— এই ছদ্মনামের আড়ালে লুকিয়ে আছেন একালের এক শক্তিশালী লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। নীললোহিতের বৈশিষ্ট্যই হলো একাধারে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তরম্পর্শী ভাষা। সাধারণ ঘটনার মধ্যে তিনি অসাধারণকে আবিষ্কার করেন, সামান্য চরিত্রের মধ্যে অসামান্যকে খুঁজে পান। বাংলা সাহিত্যে যে-এ চরিত্র ও ঘটনা এতদিন উপেক্ষিত ছিল, তাকে তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে আবদ্ধ করেছেন এবং তাকে কবিতার ভাষায় বাণীবদ্ধ করেছেন। নীললোহিতের ভাষার একটা যাদু আছে, যা পাঠকের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, মোহাবিষ্ট করে এবং শেষ পর্যন্ত ভিত্তির ভাবনায় অনুভবিত করে।

